আত্মদর্শনম্

বা

সর্বমীমাংসা

সূত্রকার ঃ স্বামী লীনানন্দ

টীকাকার ঃ শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

এম. এ., বি. কম.

প্রথম প্রকাশ
১৫ই সেপ্টেম্বর
১৯৬২ ইং

সম্পাদক :
স্বামী অসীমানন্দ তীর্থ
কলিকাতা

প্রকাশক :
ভাস্কর কুমার রায়
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

মুদ্রক :
রণজিত কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান
মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

সমর্পণম্

[এক]

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[দুই]

যতবার ফিরে যাই তুমি ততবার।
আমারে ফিরাও কি যে টানে অনিবার॥

ভূমিকা

বইখানার ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। স্বামী লীনানন্দ আমার একজন ছাত্র। এই বইয়ের ভূমিকা লেখবার কতখানি অধিকার আমার রয়েছে—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

নবযুগের জীবন-দর্শন কি হবে লেখক সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও ভাবনাকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শান্তিই যদি মানুষের লক্ষ্যস্থল হয়—তবে বিজ্ঞানাশ্রয়ী বর্তমান সভ্যতা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুখ আছে, উত্তেজনা আছে—কিন্তু এ সভ্যজগতে বাস্তবিকই শান্তির অভাব রয়েছে।

সত্য কি—সে সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করেছেন। আত্মা দেহী, দেহ নয়—এ কথা বলে বৈদিক দর্শনের কথারই তিনি পুনরুক্তি করেছেন। নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্যও তিনি বহুযুক্তির অবতারণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ঋষিদের কথাই প্রতিধ্বনিত করে তিনি বলেছেন—অপরোক্ষ উপলব্ধির দ্বারাই সকল সংশয়ের নিরসন ঘটতে পারে।

শান্তি আমরা পাই নি, শিবকে আমরা পাই নি। সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারলেই শান্তি ও শিবকে লাভ করা সম্ভব—ঋষিরা এ কথা বলেছেন। স্বামী লীনানন্দ এই বাণী সহজভাবে সকলকে জানাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা সফল হোক—এই কামনা করি।

জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত

তারিখ—৪ঠা সেপ্টেম্বর '৬২। এম.এ., পি.এইচ-ডি., ডব্লিউ.বি.এস.ই.এস

প্রিন্সিপাল

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা

সূত্রকারের বক্তব্য

আমি তখন স্বর্গাশ্রমে। একদিন জনৈক জিজ্ঞাসু এসে প্রশ্ন করল, "ঈশ্বর আছেন কি না বলুন।" প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে ঈশ্বর একজন আছেন, তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান। শাস্ত্রাদিতে তাকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবম্বিধ ঈশ্বর জগতে একজন থাকলে নিশ্চয়ই কোথা না কোথাও তার দেখা পাওয়া উচিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ঈশ্বর বলে কাউকে দেখতে পায় নি। ঈশ্বরকে কেউ দেখাতে পারে না। যাকে কেউ কোন দিন দেখে না এমন কোন ঈশ্বর সত্যিই আছেন কিনা এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই হাঁ বা না বলা যায় না। হাঁ বলা যায় না, কেন না তা'হলে জিজ্ঞাসার প্রশ্ন থাকত না, নাও বলা যায় না কেন না, না হলেও জিজ্ঞাসা থাকে না। যেখানে জিজ্ঞাসা আছে বুঝতে হবে সেখানে সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বাসীর সন্দেহ হলেই তবে সে জিজ্ঞাসা করবে। আমাকে যে জিজ্ঞাসা করেছিল তার মনে সন্দেহ আছে বুঝেই আমি বললাম, "ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন তোমার সন্দেহ আছে, তখন ঈশ্বরের কথা ছেড়ে দাও। তুমি আছ কি না তাই আমাকে বল। তুমি আছ, এ বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে?" বলা বাহুল্য নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকে না। আমি আবার বললাম, "তুমি আছ এ বিষয়ে যদি তোমার কোন সন্দেহ না থাকে, তাহ'লে বল তুমি কে? এ শরীরটাই কি তুমি? শরীরই তুমি হলে শরীরটাকেই আবার তোমার বল কেন?" "তোমার ছাতাটা" যদি "তুমি" না হও তাহলে "তোমার শরীরটা" "তুমি" হলে কি উপায়ে?" এরূপ আরও অনেক কথার পর সে স্বীকার করল যে দেহটা "আমি" নয়, আমিটা দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু। তখন তাকে বললাম, "তোমার দেহাতিরিক্ত যে "তুমি" আছ তাকে দেখতে পেয়েছ?" সে স্বীকার করল সে দেখেনি, সে জানে না। তখন আবার তাকে বললাম, "দেখো, নিজেকে না জানলে ভগবানকে জানা যায় না। নিজেকে জানো তাহলেই ঈশ্বরকে জানতে পারবে। তুমি তোমাকে না দেখলেও তুমি যে আছ এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, তেমনি ঈশ্বরকে না দেখতে পেলেও ঈশ্বর আছেন এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার কোন ভেদ নাই। তোমাকে প্রত্যক্ষ কর, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হবেন।"

এর পর নিজেকে জানা বিষয়ে তার সঙ্গে অনেক বিচার হয়েছিল সেদিন। তখন মনে হল সে সব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখলেও তো কারো কাজে লাগতে পারে। কিভাবে রাখব? সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখব, বলে ঠিক করলাম। নাম দেব ঠিক করলাম আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা।

১৯৫৯ ইংরাজী সালের ৩০শে মে তারিখ স্বর্গাশ্রম থাকা অবস্থায়ই আত্মদর্শন লিখতে আরম্ভ করি। টাঙ্কারা ও দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কালে এর খসড়া তৈরী চলতে থাকে এবং কালীপুর আশ্রমে থাকাকালে শেষ হয়।

আত্মদর্শনে সেই সনাতন সত্যকেই লোকসমক্ষে প্রকট করার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্য যা তা সনাতন। তা প্রাচীনও হয় না, নব্য বা আধুনিকও হয় না। নূতন সত্য বলে কিছুই নাই। দর্শন কোন নূতন সত্য সৃষ্টি করে না। যে সত্য আছে যুক্তিতর্ক ও বিচার সাহায্যে তাকেই পুনপ্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। দর্শনে বিচারের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়—নূতন দর্শন মানেই নূতন বিচার ধারা। ভ্রান্তি দূর করাই দর্শনের উদ্দেশ্য।

ভারতে যে কয়টি দর্শন প্রতিষ্ঠিত আছে, ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তাই যথেষ্ট। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের জন্য মানুষের বিচার ধারা বদলে গেছে। পূর্বে ধর্মে ধর্মে বিরোধ ছিল বটে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে বিরোধ বড় ছিল না। ঈশ্বর হোক, জ্ঞান হোক, ব্রহ্ম হোক, কোন একটা মহাসত্য আছে এ বিষয়ে সকল ধর্ম একমত ছিল। বিভেদ ছিল বিচারে—সেই মহাসত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে এবং সেই মহাসত্যে উপনীত হবার উপায় বিষয়ে।

বর্তমানে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুদর্শনের প্রভাবে সেই সত্যই অস্বীকৃত হতে বসেছে। ভারতের ষড়দর্শন প্রাচীনকালে রচিত হয়েছিল বলে সেই মহাসত্যের উপর আধুনিক বস্তুবাদের অস্ত্রপাত প্রতিরোধের ব্যবস্থা তাতে নাই। আধুনিক বস্তুদর্শনের আক্রমণে সেই সত্যই মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে চলেছে। ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম এসব আধুনিকদের নিকট উপহাসের বস্তু; ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তা করা আধুনিকদের নিকট Pessimism, Escapism ইত্যাদি। কাজেই সত্যই যে সত্য, ভ্রান্তি যে ভ্রান্তি একথা পুনঃ প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন আছে, এবং এই জন্যই আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা রচিত হয়েছে। আত্মাই সত্য, আত্মাই পরমাত্মা আত্মজ্ঞান হলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না, অভাব থাকে না, দুঃখ থাকে না একথাই বিচার এবং যুক্তিতর্ক সাহায্যে আলোচনা করা হয়েছে বলেই এ দর্শনের নামকরণ কবা হয়েছে আত্মদর্শন। আত্মদর্শনের অধ্যয়ন যারা করবেন তারা উপকৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি

স্বামী লীলানন্দ

লীনিকাকারের বক্তব্য

স্বামী লীনানন্দ রচিত আত্মদর্শন বা সর্ব মীমাংসাকে ভারতের একটি নূতন দর্শন বললে অত্যুক্তি হবে না। ইহা বর্তমান সময়োপযোগী এক নূতন বিচারধারা অতএব এক নূতন দর্শনও। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তা সম্পূর্ণ। আশা করি সুধী সমাজে এ নূতন দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সেই প্রাচীন কালে বাঙালী কপিল প্রণয়ন করেছিলেন সাগর-সঙ্গমে বসে সাংখ্য দর্শন। তার বহু শতাব্দী পর আর একজন বাঙালী প্রণয়ন করলেন আত্মদর্শন।

আত্মদর্শনের সূত্রগুলি এত সরল ও সহজবোধ্য যে যেকোন জন তার সারার্থ গ্রহণ করতে পারবে। সূত্রগুলির সারল্যই আত্মদর্শনকে লোকপ্রিয় করে তুলবে, আমাদের বিশ্বাস। আকারে আত্মদর্শন বৃহৎ নয়। বৃহৎ পুস্তক পাঠ করার অবসর কোথায় মানুষের! আত্মদর্শনের কলেবর ক্ষুদ্র হওয়ায় ভালই হল। পাঠের সুবিধা হবে এতে।

ভারতের সব আস্তিক দর্শনই সূত্রাকারে রচিত। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত থাকে বলে সূত্রগুলির ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্য বা টীকা বা কারিকা রচিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় অনুবাদ থাকলেও সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্য, টীকা বা কারিকা একমাত্র সংস্কৃত ভাষায়ই লিখিত হয়ে থাকে। আত্মদর্শনের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি এক দুঃসাহসের কাজ করেছি। 'লীনিকা'—এ নূতন নামে বাংলা ভাষায় সূত্রগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছি। জানি না সুধীসমাজ আমার কাজকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন। মাতৃভাষার সাহায্যেও দর্শন বিচার সম্ভব বিবেচনা করেই আমি বাংলা ভাষায় সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছি। সাধারণতঃ কোন সূত্রের ব্যাখ্যা বাংলাতে হয়না বলে তার কোন বাংলা নামও নেই। ভাষ্য, টীকা, কারিকা প্রভৃতি সংস্কৃত কাজের সংস্কৃত নাম। আমি আমার নূতন কাজের একটি নূতন নামকরণও করলাম। আমি আত্মদর্শন সূত্রের মৎপ্রণীত ব্যাখ্যার নাম দিলাম লীনিকা। উদ্দেশ্য লীনিকা নামের এ ব্যাখ্যা স্বনামেই খ্যাতি লাভ করুক। যাঁরা মৎপ্রণীত বাংলা লীনিকা গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁরা তাঁদের খুসী মত এর ভাষ্য টীকা বা কারিকা প্রস্তুত করুন, তা'তে আমার কোন আপত্তি নেই। ইচ্ছা করলে তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য মৎপ্রণীত লীনিকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

লীনিকা যেভাবে লিখব ভেবে আরম্ভ করেছিলাম সেভাবে শেষ করতে পারিনি। নানারূপ বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে আমাকে একাজ শেষ করতে হয়েছে। কাজেই এ কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি বহু হওয়া সম্ভব। সুধিগণ ত্রুটি মার্জনা করুন।

আমার একাজে একসময়ের সহকর্মী বন্ধুপ্রতিম শ্রীযুক্ত রামকমলাক্ষ চক্রবর্তী এম, এ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

লীনিকা প্রস্তুত কালে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হারিয়ে যাওয়ায় এর সঙ্গে পরিশিষ্টিত করা গেল না। আমি সকল গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ইতি—

জাঙ্গীপাড়া
১০।৫।৬২ ইং

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

প্রকাশকের বক্তব্য

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী কৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীস্বামী লীনানন্দ প্রণীত আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা নামক দর্শন-গ্রন্থটি সকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল। গ্রন্থ প্রকাশ করাই প্রকাশকের কাজ, গুণাগুণ বিচার করবেন পাঠকেরা। গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকতে পারে। সদাশয় পাঠকরা লিখিতভাবে দোষগুলির কথা জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা
৪।৯।৬২ ইং

ইতি
ভাস্কর কুমার রায়
প্রকাশক

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অথাত উপায়জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

সূত্রার্থঃ—অথ উপায় জিজ্ঞাসা আসে।

Eenglish Transltion :— Now. the device is to be saught.

লীনিকাঃ অথ শব্দ মঙ্গল জনক, কার্যারম্ভে উচ্চার্য। তাই আত্মদর্শন নামক আধ্যাত্মিক বিচারারম্ভে এর প্রয়োগ বিধিসম্মত। তবে অথ শব্দের তাৎপর্য আরও রয়েছে। আনন্তর্য অর্থে ও অথ শব্দের প্রয়োগ আছে। সূত্রে অথ শব্দ আনন্তর্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে! তা'হলে কিসের অনন্তর এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। মানুষের জানার তৃষা অসীম। মানুষ জানার সন্ধানে চলেছে সৃষ্টির প্রথম থেকে। জেনেছে ও কত। এ জানাব পথে চলতে গিয়ে করেছে কত আবিষ্কার, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক। বিজ্ঞানের ত আজ চরম উন্নতি। মানুস রকেটে পৃথিবী পরিক্রমা করছে, চন্দ্রে যাবে, শুক্রে যাবে, মঙ্গলে যাবে। আরও কত কিছু করবে সীমা নেই। য়া করেছে তা'ও কম নয়। তবে এত করেও মানুষ শান্তি পাচ্ছে না কেন? কেন তার জানার তৃষা আজও মিটল না। কেন তৃষা থাকে অপূর্ণ, ফুবিয়ে যায় মানুষ নিজে? জানার সন্ধানীরা এর উত্তরের সন্ধান ও করেছেন। কেউ কেউ পেয়েছেন ও। যারা পেয়েছেন তাঁরা ঋষি। তাঁরা দ্রষ্টা। তারা বলেছেন তৃষা আমাদের জানার নয়। তাই এতকিছু জেনে, বহু কিছু জেনে, বাইরের সব কিছু জেনেও তৃষার তৃপ্তি হচ্ছে না। কারণ তৃষা আমাদের জানার নয়; তৃষা আমাদের জ্ঞানের। যে জ্ঞান দিয়ে এত সব জানছি সেই জ্ঞান ব্যতীত তৃষায় নিবৃত্তি সম্ভব নয়। জানার পেছনে যারা ছুটে চলছে, তারা চলুক। যারা বুঝতে পেরেছে. যে বাইরের সব কিছু জানলে ও তৃষা মিটবে না, যাদের স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে তৃষা জ্ঞানেরই অথচ জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না অনন্তর একমাত্র তাদেরই জিজ্ঞাসা হবে: জ্ঞান লাভের উপায় কি?

এ জিজ্ঞাসা সহজে আসে না। যাঁরা খবরকেই জ্ঞান বলে ঠিক করে বসে

আছে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা তাদের আসতেই পারে না। খবর যে জ্ঞান নয়, এ সহজ সত্য তারা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না। আমাদের সমাজের অধিকাংশ পণ্ডিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি খবরজ্ঞ। তারা সব খবর জানেন এবং জানান। পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর, দেখবে তাঁরা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন যে তারা ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম সব কিছু জানেন; উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, দেখবে তারা পৃথিবীর সব জানেন, এমন কি রকেট, স্পুটনিক লুনিক প্রভৃতিও। বিচার করে দেখলে বুঝা যাবে যে তারা খবর মাত্র জানেন। এবং খবর জ্ঞান নয়। খবরই যদি জ্ঞান হত তা'হলে আমাদের দেশের খবর জানা সব ব্যক্তিই আকাশে রকেট নিক্ষেপ করতে পারত। পারে না কেন? না রকেট সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই। যে বৈজ্ঞানিক সারাজীবন গবেষণাগারে কাটিয়ে স্পুটনিক আবিষ্কার করেছেন একজন খবর জানা ব্যক্তির জ্ঞান কি তাঁর জ্ঞানের সমান? তা হতে পারে না। খবর জানা ব্যক্তির যে জ্ঞান তা অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ যে খবর জানা অজ্ঞরা অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান বলে স্থির হয়ে আছে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা তাদের আসে না। অজ্ঞানতা সম্বন্ধে যাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে অথচ জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না, অনন্তর একমাত্র তাদেরই জিজ্ঞাসা হবে: জ্ঞান লাভের উপায় কি?

অজ্ঞানতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় কি ভাবে হওয়া যায়? উত্তর: বিচার দ্বারা। বিচার করে দেখতে হবে আমরা কি চাই। পাওয়ার সঙ্গে চাওয়ার সামঞ্জস্য কতটুক আছে। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়া যদি মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে উভয়ই সত্য। যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া গেলে আর সব মীমাংসা হয়ে যায়; চাওয়ারও কিছু বাকী থাকে না, পাওয়ারও কিছু বাকী থাকে না। কিন্তু দেখা যায় চাওয়ার সঙ্গে পাওয়া কিছুতেই মিলে না। প্রথমত যা চাই তার বহু কিছুই আমরা পাই না, কারণ চাওয়ার বস্তু অনন্ত কিন্তু পাওয়ার বস্তু সান্ত, জীবন আমাদের স্বল্প, অবস্থান সীমিত। দ্বিতীয়ত যা পাই পেয়ে দেখি আসলে তা চাই না। যা পাই তাই যদি চাওয়া হয় তা'হলে ও সব মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু একটা পেয়েই মনে হয় অন্য আর একটা চাই। তা'হলে বুঝতে হবে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়া দুটোতেই ভুল হচ্ছে। অতএব দুটোই অজ্ঞানতা। এ অজ্ঞানতা সম্বন্ধে যারা দৃঢ়বিশ্বাস, অথচ যাদের জ্ঞানের জ্ঞান হয়নি অনন্তর একমাত্র তাদের জিজ্ঞাসা হবে: জ্ঞান লাভের উপায় কি?

মানুষ কি চায়? বিচার করলে দেখা যায় মানুষ সুখ চায়। অতএব বুঝতে হবে মানুষের দুঃখ আছে। সুখ যদি থাকত তবে আর মানুষ সুখের

চেষ্টা করত না। যার দুটো চোখ আছে সে অন্যের চোখ পেতে চায় না। যার যা আছে তার পক্ষে আর তার পাবার প্রয়োজন নেই। যা নাই তাই পাবার চেষ্টা আমরা করি। যেহেতু সুখ পাবার চেষ্টা আমরা করি অতএব বুঝতে হবে সুখ আমাদের নেই। আছে দুঃখ। আমরা চাই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ। সাংখ্যকার দুঃখকে তিন রকমের বলেছেন এবং তাঁর অত্যন্তনিবৃত্তির নামই পুরুষকার বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই মানুষ যা কিছু করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ করে। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ সকল মানুষেরই উদ্দেশ্য হলেও উপায় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক, করে দেখা যাক দুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে উপায়গুলি কতদূর কার্যকরী।

পৃথিবীতে এমন কেউ কেউ আছে যারা মনে করে যে আত্মহত্যা করলেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং তারা আত্মহত্যা করে। সাধারণের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক এ্যারিষ্টটলের মত দার্শনিক, হ্যামিংওয়ের (E Haming way) মত সাহিত্যিক আত্মহত্যা করেছেন বলে শুনা গেছে। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য এ উপায় কি যোগ্য? যোগ্য যে নয় এবিষয়ে আশা করি কারো আপত্তি থাকতে পারে না। যাদের আপত্তি আছে তারা এ উপায় অবলম্বন করুক। এতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

পরায়ণ যারা, ভোগবিলাস পরায়ণ, তারা মনে করে প্রচুর ভোগ বিলাসের মাধ্যমে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তাদের মতে ভোগ উপভোগ এবং আবেদন বিনোদনই সুখের বিষয়। দুঃখ সম্বন্ধে তারা সচেতনই নয়।* লক্ষ্য তাদের সুখ প্রাপ্তি, আধুনিক অভিনেতারা বা জননেতারাই তাদের আদর্শ। তারা মনে করে চিত্রতারকা বা নেতা উপনেতারাই সুখী, অতএব তাদের মত হতে পারলে সুখ অনিবার্য, সুনাম হাতের মুঠোয়। প্রথমতঃ সকলের পক্ষে নেতা-অভিনেতা হওয়াই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ নেতা-অভিনেতা হতে গিয়ে যে পরিমান দুঃখ ভোগ করতে হয় (সহজেই নেতা চিত্রতারকা হয়ে যাওয়া গেলে সকলই হচ্ছে না কেন?) সে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও সকলের নেই। তৃতীয়ত নেতা-অভিনেতার জীবনই সুখের একথা কে বলল?

* টিকা: দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া সম্ভব। মাতাল কি সুখে রাস্তায় গড়াগড়ি যায়? সে যে মহাদুঃখ পাচ্ছে এবিষয় সে সচেতন নয়। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করা পুকুরে জল শৌচ করা যে নোংরামী এ বোধ শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেরই নাই। এ যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি দুঃখ সম্বন্ধে যে অনেকের বোধ নাই তাও ঠিক।

অপরের কথা ছেড়ে দেই। গিরীশ বাবুর কথা ধরি। গিরীশ বাবু বড় নাট্যশিল্পী নাট্যকার। তিনি বিয়ে করেছিলেন দুবার। মদ্য এবং তদানুষঙ্গিক ভোগে তিনি ছিলেন নিমজ্জিত। তিনি ত আধুনিক ছিলেন, অপ্‌টিমিষ্ট্‌ ছিলেন। তবে কেন শেষে অনাধুনিক অল্পশিক্ষিত রামকৃষ্ণ ঠাকুরের চরণ আশ্রয় করে ছিলেন! যদি ভোগী গিরীশ বাবু ভোগে সুখ না পেয়ে থাকেন তবে অন্য যারা আদর্শ অভিনেতা তারা সুখে আছে কে বলল?' নেতা হলেই যদি সুখ হত তবে ম্যালেনকভ বুলগেনিন, যারা রাশিয়ার মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন তাদের সুখ হত। তারা কি সুখী। তাদের যদি সুখ না থাকে তবে ক্রুশ্চেভেরই সুখ আছে একথা কে বলল? তবু যারা মনে করে যে ভোগ বিলাসেই সুখ পাওয়া যায়, সুখের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই তাদের জ্ঞানের জিজ্ঞাসা আসতে পারে না। যারা বিচারদ্বারা ভোগের অনিত্বতা উপলব্ধি করেছেন, যারা বুঝতে পেরেছেন যে বিষয় ভোগের মধ্যে শান্তি নেই, শান্তি আছে জ্ঞানে, অথচ জ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে না অনন্তর তাদেরই জিজ্ঞাসা হবে, জ্ঞান লাভের উপায় কি?

সূত্রকার এরূপ জিজ্ঞাসাকারী কে হবে তার নির্দেশ সমাপন করে দ্বিতীয় সূত্র স্থাপন করছেন

ব্রহ্ম সুপ্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থঃ যে হেতু ব্রহ্ম সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারের প্রয়োজন নাই ব্রহ্ম লাভের উপায় হবে একমাত্র জিজ্ঞাসা।)

English Translation :—For, the Supreme absolute spirit Brahma is firmly established.

লীনিকা: জ্ঞানের মধ্যেই শান্তি, আনন্দ, পূর্ণতা যদি থাকে তবে আমাদের সকলেরই শান্তি, আনন্দ, পূর্ণতা থাকা উচিত, কারণ আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ত আছেই। পৃথিবীতে কেউই অজ্ঞান নয়, সকলের কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞান আছে। তবে সকলেই শান্তি, আনন্দ বা পূর্ণতা অনুভব করছে না কেন? এ ধরণের প্রশ্নও স্বাভাবিক। সত্যিই ত। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ত সকলেরই রয়েছে! এর উত্তরে আমরা বলব যে বিভিন্ন বিষয়ের যে জ্ঞান

তা জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান নয়। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। মনে করি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবের জ্ঞান রয়েছে। যে ইতিহাস বিষয় অধ্যয়ন করেছে তার ইতিহাসের জ্ঞান রয়েছে যে অর্থনীতি অধ্যয়ন করেছে তার অর্থনীতির জ্ঞান রয়েছে, এরূপ কারো সাহিত্যের জ্ঞান, কারো দর্শনের জ্ঞান, কারো বিজ্ঞানের জ্ঞান রয়েছে। আমি যদি আইনষ্টাইনের সব সূত্রগুলো অধ্যয়ণ করে থাকি তা'হলে আইনষ্টাইনের বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে, এরূপ বলতে পারি। এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। আচ্ছা, কালিদাস কি অজ্ঞান ছিলেন? নিশ্চই না। কিন্তু তিনি ত আইনষ্টাইনের বিষয়ে কিছু জানতেন না। তা'হলে দেখা যায় আইনষ্টাইনের বিষয় না জানা ও অজ্ঞানতা নয়। যা না জানা অজ্ঞানতা নয়, তা'হলে তা জানাও জ্ঞান নয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিষয়ের জ্ঞান জ্ঞান নয়। তবে জ্ঞান কি? জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থাই জ্ঞান। জ্ঞান যে আছে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নাই। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আছে এ বিষয়ে প্রত্যেক নিঃসন্দেহ, তেমনি জ্ঞান ও যে আছে এ বিষয়ে সকল নিঃসন্দেহ। সন্দেহ শুধু জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে। জ্ঞানের স্বরূপে যারা উপনীত হয়েছেন স্বরূপজ্ঞান একমাত্র তাদেরই আছে। জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থার নামই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা স্বরূপজ্ঞান নির্বিষয়। এ জন্যই বিষয় জ্ঞানে স্বরূপ জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, বিষয় জ্ঞানে শান্তি আনন্দ বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জ্ঞানে পূর্ণতা আসে তা স্বরূপজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। সূত্রের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মকে প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন নেই। যে উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সে উপায় কি এই আমাদের জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত।

ব্রহ্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন এর প্রমাণ কি?—এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হতে পারে। এ জন্য পূর্বথেকেই সূত্রকার পরবর্তী সূত্রে তার উত্তর প্রদান করেছেন

সাক্ষাৎ প্রমাণম্ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ: সাক্ষাৎ ই প্রমাণ।

English Translation :—Discernment is the proof. For knowing the Absolute realisation of the same in actual

perception is the best thing to be done. No other proof then is necessary.

লীনিকা : প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে যা প্রত্যক্ষ হয় তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হয়। যা জ্ঞানে প্রত্যক্ষই হয় তার জন্য অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন? সূত্রকারের উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নিঃসন্দেহ হোক। এখন কোন কোন ব্যক্তি তর্ক উত্থাপন করে বলতে পারেন যে যা প্রত্যক্ষ হয় সূত্রকার বা লীনিকাকার তা সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়ে অবশ্যই দিতে পারেন। প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেই ত সব মীমাংসা হয়ে যায়। তদুত্তরে বলা যেতে পারে যে যা প্রত্যক্ষ হয় তা প্রত্যক্ষযোগ্য বলে সহজেই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে এমন কি কথা থাকতে পারে। যিনি লণ্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটন বা টোকিও প্রত্যক্ষ করে ভারতে ফিরে এসেছেন তাকে যদি বলা হয় ঐ ঐ জায়গা সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে তবে তিনি কি পারবেন? তবে? এক পার্থিব জায়গাই যদি অপরকে প্রত্যক্ষ করানো সম্ভব না হয় তবে সে অপার্থিব পরমার্থকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেওয়া যাবে? বললেই তা হয় না। অতএব সূত্রকার বা লীনিকাকারের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কারো অভিযোগ থাকা সমীচীন নহে। তবে প্রত্যক্ষ করার ও উপায় আছে। যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হয় সে উপায় অবলম্বন করে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্দেহ হবার জন্যই সূত্রকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সাক্ষাৎই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এতে তর্কের অবকাশ থাকে না। একবার যার সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তার অন্য প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় না।

তবে ব্রহ্ম যাদের জ্ঞানে এখনও প্রত্যক্ষ হয়নি এমন সব জিজ্ঞাসুদের অববোধনের জন্য সূত্রকার প্রমাণান্তর অবলম্বন করে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাৎ বা ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ : শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি আর্ষ শাস্ত্র গ্রন্থ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

English Translation :—Authenticity of the scriptural works like the Shrutis, the Smritis and the Puranas may also be taken as the proof of the all pervading Brahma.

টীকা—সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি ই শ্রুতি বা বেদ।

দীনিকা: সূত্রের 'বা' কথাটি প্রণিধান যোগ্য। এতে পূর্বসূত্রের সঙ্গে যোগরক্ষা করা হয়েছে। পূর্বসূত্রে সাক্ষাৎকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলা হয়েছে। সাক্ষাৎ প্রমাণ সহজলভ্য নয় বলে সূত্রকার অন্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। আধ্যাত্মিক বিচারে অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য এবং প্রচলিতও। অতএব ইহা যুক্তি সঙ্গত। ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত হলেও সকলের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহে বটে। তাদের জন্য বেদ বেদান্ত গীতা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থই প্রমাণ। বেদাদি শাস্ত্র ঋষি বাক্য এবং ঋষি বাক্য আপ্ত বলে তা প্রমাণও। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে বলা আছে। বেদান্তকার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সুষ্ঠু নিরসন করেছেন। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এসম্বন্ধে কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করতে পারেন এই বলে যে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ হতে পারে না। পুরাণাদিতে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে যা বেদের বিরুদ্ধ এবং অপ্রণিধানযোগ্য। কেউ-কেউ বলতে পারেন যে একমাত্র সংহিতাই প্রমাণ, ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ বিশেষ করে পুরাণাদি পরবর্তী কালের রচিত বলে প্রামাণ্য নহে। এর উত্তরে বলতে হয় যে যা পরবর্তী কালের তাই যদি অগ্রাহ্য হয় তবে তার্কিকেরাই সর্বাগ্রে অগ্রাহ্য—তাদের তর্ক চলতেই পারে না। কেননা তারা পুরাণাদির ও পরের। যা প্রমাণযোগ্য তা অবশ্যই প্রামাণ্য। পুরাণাদিতে নানারূপ রূপক উপমা যুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু এ রূপক উপমা তাৎপর্য পূর্ণ। নিজে নিজে পড়লে এসব বুঝা যায় না। শাস্ত্র নিজে নিজে পড়তে নেই। শাস্ত্রজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ গুরুর নিকট বসে তবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। নতুবা শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পরন্তু ভুল করার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। সাধারণ এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী মনুষ্যের জন্য পুরাণাদি রূপকমাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এ রূপকের বারিধি থেকে অধ্যাত্মমুক্তাবলী নিজে নিজে আহরণ করা যায় না। যারা পণ্ডশ্রম করেছেন তারা রূপকের জলে হাবুডুবু খেয়ে শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন পুরাণাদি অপ্রামাণ্য। তাদের সিদ্ধান্তে সত্যের কিছু আসে যায় না। নাস্তিকেরা বেদকে অস্বীকার করে বলে বৈদিক সত্যের যেমন কোন হানি হয় না তেমনি পুরাণবিদ্বেষীরা পুরাণ না মানলেও পুরাণের কোন হানি হয় না। বেদের সঙ্গে পুরাণের বিরোধ নেই। বেদের সত্যকেই পুরাণ বুঝাবার জন্য রূপকাদির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রূপক ছেড়ে দিলে যা থাকে তা সত্য। আর যা সত্য তাই প্রমাণ। আমি আগেই বলেছি পুরাণাদি থেকে তত্ত্ব বুঝে নিতে গেলে

তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট থেকে বুঝে নিতে হয়। নিজে নিজে বুঝা যায় না। যারা বুঝতে পারেন না তারা পুরাণাদি বাদ দিলেও দিতে পারেন। ক্ষতি নেই। শাস্ত্রের ত অভাব নেই। যে শাস্ত্র পাঠে যার বুঝ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবে না তিনি সে শাস্ত্র পাঠ করলেই পারেন। নিঃসন্দেহ হবার জন্যই শাস্ত্র পাঠ। যে যে শাস্ত্র পড়ে নিঃসন্দেহ হবেন তিনি সে শাস্ত্রই পাঠ করুন।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে বেদান্তে যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার হয়েছে তা থেকে যখন বুঝা যায় যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য তখন সেখানেই ত মীমাংসা হয়ে গেল। তবে আবার সর্বমীমাংসার কি প্রয়োজন? এর উত্তর দুটো কথা বলতে হয়। প্রথমতঃ বেদান্ত পাঠে ব্রহ্ম বুঝা যায় বটে; কিন্তু বুঝে ব্রহ্ম বুঝা গেলেও জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কেবল বেদান্ত পাঠে ব্রহ্ম বুঝার যে জ্ঞান হয় তা খবর জ্ঞান মাত্র। খবর জ্ঞান অজ্ঞানতারই সামিল। অতএব বেদান্তের পরও বেদন্তের* প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বস্তু-বিজ্ঞান ও বস্তুদর্শন আধ্যাত্মিক সত্যের উপর এক চরম আঘাত হেনেছে। বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুদর্শনের আক্রমণে ব্রহ্মই মিথ্যা এবং বস্তুই সত্য এরূপ বিপরীত ধারণাই জন সমাজে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। বস্তুই যাদের জ্ঞানে চিরসত্য হয়ে উঠেছে তাদের ব্রহ্মের কথা শুনানো বৃথা। কিন্তু এখনও যারা ব্রহ্মের অস্তিত্বের খবরে কিছু কিছু আস্থা রাখেন অথচ বস্তুদর্শনের প্রভাবে পড়ে সন্দেহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, ব্রহ্মসূত্র পড়ে ব্রহ্মের খবর জেনেও ব্রহ্ম সত্যই আছে না কি নির্ণয় করতে পারছেন না তাদের জন্য উত্তর মীমাংসার পরও সর্বমীমাংসার প্রয়োজন আছে। আত্মদর্শন হইলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয় বলেই আত্মদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে শাস্ত্র যদি নিজে নিজে পড়া না যায়, তত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞ গুরুর সন্ধানও যদি না পাওয়া যায় তা'লে জিজ্ঞাসু কি করবেন। তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন—

আত্মদর্শিনশ্চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ: আত্মদর্শী মহাপুরুষদের বাক্য ও প্রমাণ।

English Translation :—The Revelation of great those who have acquired the Divine knowledge is also no less proof.

*টীকা :—বেদ-ই অন্তে যার তাই বেদন্ত। বেদ=জ্ঞান

লীনিকা :—বস্তুবাদীদের আবির্ভাব নূতন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রাচীন কালেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। তবে বর্তমানে তাদের প্রভাব অভূত-পূর্ব একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু এর মধ্যেও আজও মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের আগমন ঘটে। আত্মদর্শী মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তারা ত্যাগের পথ অবলম্বন করে সাধনাদ্বারা আত্মদর্শন করেছেন—ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি ও লাভ করে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তাদের আপ্ত বাক্যও প্রমাণ। ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, পূর্ণানন্দ পরহংস, ভূমানন্দ পরমহংস, শ্যামাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়—কত নাম করব, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ। তাদের কথা অবশ্যই প্রমাণ বলে মানতে হবে। বিবেকানন্দ প্রমুখরা কখনও অসত্য বলেন নি। তারা যখন বলেছেন; ব্রহ্ম আছে এবং ব্রহ্মই সত্য তখন ব্রহ্ম আছে এবং ব্রহ্মই সত্য।

এরূপ প্রমাণ প্রদান পুর্বক সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উত্থাপন করছেন

কিমথ নাস্তিকমতম্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ : (প্রতিপক্ষ সূত্র):—নাস্তিক মতগুলি তবে কি? অর্থাৎ নাস্তিক মতগুলো ত অস্বীকার করে।

English Translation :— What about the atheistical tenets?

লীনিকা :—এ সূত্রে সূত্রকার নিজেই প্রতিপক্ষ স্থাপনা করছেন। প্রতিপক্ষ এরূপ : বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে তেমনি অনেক নাস্তিক মতের ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সেগুলিও ত ধর্ম-শাস্ত্রই। সে সব ধর্মশাস্ত্র ত মহাপুরুষদের বাণী এবং আদর্শ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাস্তিক শাস্ত্রগুলো ও সুযুক্তিপূর্ণ। আস্তিক শাস্ত্র প্রমাণ হলে নাস্তিক শাস্ত্রই বা প্রমাণ নয় কেন? নাস্তিক মতগুলি মানতে গেলে ত আস্তিক মত মানা যায় না।

অতঃপর প্রাচীন ও আধুনিক নাস্তিক মতগুলি কি কি হতে পারে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিপক্ষ সূত্র প্রদান করা হচ্ছে

বৌদ্ধচার্বাকাঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ : (প্রতিপক্ষ সূত্র)—উদাহরণত বৌদ্ধ ও চার্বাক মতগুলির উল্লেখ করা যায়।

English Translation :—The doctrines of Buddhism and Charbakism may be cited for instance.

লীনিকা :—ইহা ও প্রতিপক্ষ সূত্র, পূর্ব সূত্রের সপক্ষে দৃষ্টান্ত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চার্বাককে কেউ ঋষি বলে না বটে কিন্তু তবু লোকচিত্তে চার্বাকের প্রভাব কম নহে, পরন্তু বহু ঋষির চেয়েও বেশী। নাস্তিক দর্শন বলতে বিশেষ করে চার্বাক দর্শনই বুঝায়। চার্বাক মতের আবার দুই বাদ আছে। দেহাত্মবাদ অনুসারে চার্বাক সিদ্ধান্ত হল এই যে শুক্রশোণিতের পরিণাম রূপ এ দৃশ্যমান দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। দেহের বিনাশে আত্মারও বিনাশ হয়। আবার দৈহিকপরিমানবাদ অনুসারে চার্বাক সিদ্ধান্ত হল এই যে দৃশ্যমান স্থূল দেহই আত্মা নয় বটে, তাতে যে চৈতন্য আছে তাই আত্মা (অর্থাৎ মনই আত্মা)। কিন্তু এ চৈতন্য বা আত্মা দেহের পরিণাম মাত্র—দেহ সৃষ্টির সময় জন্মে, পূর্ণতাকালে স্থিতিলাভ করে এবং দেহের বিনাশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মোটকথা মৃত্যুতেই সব শেষ, তারপর আর কিছু থাকবে না। অতএব "ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" প্রতিপক্ষ তর্ক উপস্থিত করতে পারেন এই মর্মে যে প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে দেহের বাইরে দেহীর কোন অনুভূতিই নেই তবে দেহাতিরিক্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব কোথায় অনুভব করা যাবে। কাজেই চার্বাক মতইত সত্য। দেহের পর আর কিছু থাকে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলবেন যে দেহের বাইরে দেহীর অনুভূতি নাই বলে দেহের অতিরিক্ত কিছু নাই এটা অযৌক্তিক! কারণ দেহের অভ্যন্তরেই দেহীর অনুভূতি কতটুকু। দেহে মস্তিস্ক কি ভাবে কাজ করছে, কিভাবে হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালিত করছে, কিভাবে ফুস্ ফুস্ বাতাস গ্রহণ করছে, কিভাবে দেহ-কোষগুলি জন্মাচ্ছে মরছে—এসবেব কোন অনুভূতিই কারো নাই বলে কি এদের অস্তিত্ব নেই ? তবে দেহাতিরিক্ত আত্মার বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকবে না কেন ? প্রতিপক্ষ পুনবায় তর্ক উপস্থিত করে বলতে পারেন যে চার্বাকের কথা ছেড়ে দিলেও বুদ্ধদেবের কথা ত ফেলে দেওয়া চলতে পারবে না। তিনি ত স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে আস্তিক গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছেন। তিনি পুনর্জন্ম মানলে ও আত্মার নিত্যত্ব অস্বীকার করেছেন। আত্মা যদি অনিত্ব হয় তবে তার নিত্যজ্ঞান লাভ কি ভাবে সম্ভব। বৌদ্ধ দর্শনের আবার চারটি বাদ আছে। সর্বশূন্যবাদ মতে এজগতে সৎ বা সত্য কিছুই নেই। দেহ নষ্ট হলেই মুক্তি। আদিতে কিছু ছিল না, অন্তে কিছু থাকে না। সবই শূন্য।

বিজ্ঞানবাদ মতে আত্মা ক্ষণিক। আমি-আমি ইত্যাকার জ্ঞান প্রবাহই আত্মা। এ জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে আবার ধ্বংস হচ্ছে। তবে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে বলে সত্য ও দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বিজ্ঞানই ক্ষণিক। অনুমেয় বাহ্যবস্তুবাদও প্রায় এরূপই। প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তুবাদ মতে বস্তু বাহিরে হলেও প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং তা ক্ষণিক। বৌদ্ধ দর্শন মতে আত্মার পুনর্জন্ম আর কিছুই নয় এ যেন এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপের প্রজ্জ্বলন। তবে এক সময়তা নির্বাণপ্রাপ্ত হবে আর তখন কিছুই থাকবে না। প্রতিপক্ষের যুক্তি এই যে স্বয়ং বুদ্ধদেবই যখন বলে গেছেন কিছু থাকে না তখন আবার শাশ্বত বস্তু কি থাকতে পারে। নাস্তিক দর্শনমত পুষ্ট প্রতিপক্ষের জবাব পরবর্তী কালে সূত্রকারই দিয়েছেন। আমরা এখানে শুধু একটা কথা এই বলতে চাই যে বুদ্ধদেব কোন দর্শনই রচনা করে যান নি। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে দর্শন রচনা করেছেন তা বৌদ্ধ দর্শন হলেও বুদ্ধদেবের রচিত নহে। অতএব বৌদ্ধ দর্শন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবকে জড়ান সঙ্গত হয় না।

যাইহোক, কেবল নাস্তিক দর্শনই যে একমাত্র প্রতিপক্ষ তা নয়। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ আরও থাকতে পারে এরূপ বিবেচনা করে সূত্রকার পরবর্তী প্রতিপক্ষ সূত্র উপস্থিত করছেন

বস্তুবিজ্ঞানঞ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ :—(প্রতিপক্ষ): আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের নব নব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ত শাস্ত্রবর্ণিত বহু সত্য নস্যাৎ করে দিয়েছে।

English Translation: The modern Scientific inventions have falsified many Scriptural truths.

লীনিকা: ইহাও প্রতিপক্ষ সূত্র। বর্তমানে বস্তুবিজ্ঞানের উন্নতি চরমশিখরে আরোহণ করেছে বলা যেতে পারে। মানুষের জীবন আজ বস্তুবিজ্ঞানের চিন্তাধারায়ই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের এ অভাবনীয় উন্নতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। শাস্ত্রদিতে বর্ণিত কাহিনী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলে বিজ্ঞান প্রমাণ করছে। কোথায় শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গ? কোথায় হিমালয়ে শিবগৌরীর কৈলাস? কোথায় ভগবানের সর্বশক্তিমানতা? মানবরাই নিজ শক্তি বলে বস্তুবিজ্ঞানের গবেষণা করে আণবিক শক্তি পেয়েছে, রকেটযোগে আকাশে স্পুটনিক নিক্ষেপ করেছে। মহাকাশ যাত্রা সুরু হয়েছে। চন্দ্রলোক সূর্যলোক ধ্রুবলোক পাবার জন্য আর মৃত্যুর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

সৃষ্টির বিবর্তন বাদে ব্রহ্মের নামগন্ধ নেই। বিজ্ঞান যখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারছে না তখন ব্রহ্ম বলে কিছু নেই আর এর জন্য চেষ্টাকরারও কোন প্রয়োজন নেই ইত্যাদি।

প্রতিপক্ষের উত্তর সূত্রকার পরে নিজেই প্রদান করবেন। এখানে তবু এ প্রসঙ্গে দুএকটা কথা বলা যাক। প্রতিপক্ষ নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানীরা ব্রহ্ম নাই এমন কথা কখনও বলে না। বিজ্ঞান যে পর্যন্ত জেনেছে তার অতিরিক্ত (Thus far, no farther) কিছুই বলে না। বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করে যে বিশ্বের রহস্য এখনও রহস্যই আছে, এখনও জানার বহু বাকী। কেবল খবর পড়া অবৈজ্ঞানিকেরাই যারা কিছুই না জেনে মনে করে সব জানা হয়ে গেছে—এরূপ উক্তি করতে পারে। যে নিজে বিজ্ঞান জানে না, তার মুখে বিজ্ঞানের বুলি শোভা পায় না। দ্বিতীয়ত প্রাচীন যুগে মানুষের ধনুক আবিষ্কার, কিংবা ঘুড়ি উড়াবার কৌশল আবিষ্কার যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত করতে পারে নি তেমনি বর্তমানের রকেট বা স্পুটনিক আবিষ্কার ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তাকে নাকচ করে দিতে পারে না। স্পুটনিক আবিষ্কার হয়ে গেছে বলে কি স্ত্রীপুরুষে যে প্রেম হয় ভালবাসা হয় তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে?' স্পুটনিক আবিষ্কার হয়ে গেলেও যদি সেই আদিমকালের মতই প্রজা উৎপাদনে স্ত্রীপুরুষ সঙ্গম সত্য কার্য হয়ে থাকে, তবে শান্তি লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন ইহা ও পূর্বের মতই সত্য। সত্য যা তা আদি অন্ত সত্য। স্পুটনিক আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কি মানুষের মধ্যে আর সুখ দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে না, তবে স্বর্গনরক নাই এ সিদ্ধান্ত পতিপক্ষ কি ভাবে করতে পারেন? যাই হোক এ প্রসঙ্গে সূত্রকারের উত্তর পরে আলোচিত হচ্ছে।

বস্তুবিজ্ঞান ছাড়াও প্রতিপক্ষ আরো থাকতে পারে এরূপ বিবেচনা করে সূত্রকার নিজেই আরও একটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করছেন

কম্যুনিজম্ চ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থঃ—(প্রতিপক্ষ) কম্যুনিজম্ ও শাশ্বত আত্ম বা ব্রহ্ম স্বীকার করে না।

English Translation: The Philosophy of Communism too does not believe in any Brahma or so. Communists are disbelievers.

লীনিকা : ইহাও প্রতিপক্ষ সূত্র। বর্তমানে কম্যুনিজম্ পৃথিবীতে এক নূতন আলোড়ন এনেছে। পৃথিবীর সবদেশেই অল্পাধিক সংখ্যক কম্যুনিষ্ট রয়েছে! বাস্তব ক্ষেত্রে কম্যুনিজম খারাপ এরূপ বলা যায় না। মানুষে মানুষে সাম্য সৃষ্টি করাই কম্যুনিজমের মূল নীতি। এ নীতি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাম্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু কম্যুনিজম সংকীর্ণ বস্তুবাদী এবং অবিশ্বাসী। অতএব কম্যুনিজম নাস্তিক দর্শন। কম্যুনিজমের ও বহুদিক আছে এবং প্রত্যেকদিকেই বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, বাদানুবাদ হয়েছে। সব কিছুর এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। এ প্রসঙ্গে যা প্রয়োজন আমরা কেবল তারই উল্লেখ করব—অবশ্য সংক্ষেপে।

কম্যুনিজম্দর্শন বলে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে স্ববিরোধ রয়েছে—প্রত্যেক বস্তুতে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক গুন রয়েছে, তাতে চলছে অনবরত সংগ্রাম আর সংগ্রাম বশেই সব কিছু চলছে প্রগতির পথে। এদৃশ্যমান পৃথিবী কোন আদর্শ সত্ত্বা (absolute idea) বা বিশ্বব্যাপক শক্তি (universal spirit) বা চৈতন্যের (consciousness) বিপ্রতিমূর্তি (Embodiment) নয়; এই পৃথিবী স্বভাবতই বস্তুময়ী (Material)। ইহা আমাদের মনের বাইরে অবস্থিত। মনে তার প্রতিবিম্ব পড়ে। মন মস্তিস্কের কার্য মাত্র। মস্তিষ্ক বস্তু। অতএব বস্তু থেকে চিন্তাধারা পৃথক করা যায় না। বস্তুর অতিরিক্ত কিছু থাকতে পারে না। বস্তুই সত্য (Material is the only reality)। জ্ঞান বস্তুরই সৃষ্টি। বস্তু জগৎই জ্ঞেয় (Knowable) যে বস্তু এখনও জানা যায় নি কার্যকরী বিজ্ঞানের সাহায্যে সে সব বস্তুই জানতে হবে। অর্থাৎ যা আছে তা বস্তুই, বস্তুর অতিরিক্ত কিছু নাই।

বস্তুবাদের যৌক্তিকতা সূত্রকার স্বয়ং খণ্ডন করেছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একথা বলা যায় যে আধুনিক কম্যুনিজম থেকে ব্রহ্মের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। হেগেল মার্ক্স প্রভৃতিরা কয়েকটি আদর্শবাদী ইউরোপীয় দর্শনের (কেন্ট প্রমুখ দার্শনিকদের) মতবাদকে খণ্ডন করার প্রয়াস করেছেন বটে; তবে সে আদর্শবাদী দর্শনই ত ব্রহ্ম নয়। শ্যামের মাথায় কোপ দিলেই রামের মাথা কাটা যাবে এর কোন কথা নেই। মার্ক্স প্রমুখ বস্তুবাদীদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকতে পারে না। বস্তুই যদি জ্ঞানের কারণ হত তাহলে বস্তুমাত্রেই জ্ঞান হচ্ছে না কেন। মৃত-ব্যক্তির মস্তিস্ক কোন কিছু চিন্তা করে না কেন? বিমূঢ়রাই কুতর্ক করে।

তা করুক। তাদের জন্য আত্মদর্শন নয়। কেবল সন্দেহভারাক্রান্ত

জিজ্ঞাসুদের সন্দেহ মোচনের জন্যই আত্মদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে। উদ্দেশ্য, "হে জিজ্ঞাসু, আত্মদর্শন কর। তাহলেই সন্দেহ থাকবে না" এ সত্য বলা।

সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্থাপনানন্তর সূত্রকার প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য উত্তর পক্ষ স্থাপনা করে সূত্র উপস্থিত করছেন

নাস্তিকম্ আস্তিকেন হি—ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-যোগ-

বেদান্তৈঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ:—নাস্তিক মতগুলি ন্যায়, বৈশেষিক সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন কর্তৃক পূর্বেই খণ্ডিত হয়েছে।

English Translation: All the tenets of atheism have already been refuted by theistical philosophies like the Nyaya, The Vaishesika' the Samkhya, the Yoga, the Vedanta etc.

লীনিকা: এবার সূত্রকার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদান করছেন। নাস্তিক আস্তিকের মধ্যে বিবাদ আজকের নূতন নয়, বহুদিন থেকেই আছে। থাকবে ও। নাস্তিকেরা চিরদিন এই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে দৃশ্যমান বস্তু জগতের বাইরে আর কিছু নেই, দেহের অতিরিক্ত আত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই। তারা যতটুকু জানতে পেরেছে ততটুকু বলেছে। এর বেশী তারা জানে না। ইহা তাদের অজ্ঞানতাই। অন্ধেরা সূর্য দেখে না। সূর্যের জ্ঞান তাদের নেই তাতে কি প্রমাণ হয় সূর্য নেই? অন্ধের তর্ক শ্রোতব্য বা ধর্তব্য নহে। আমরা চক্ষুষ্মানদের কথাই ধরব। চক্ষুষ্মান—প্রজ্ঞাচক্ষু বিশিষ্ট ঋষিদের জ্ঞানে যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়েছে তাই তারা বলে গেছেন। তাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্মিত হয়েছে আস্তিক দর্শনগুলি। এ আস্তিক দর্শনগুলিতে পূর্বেই নাস্তিক্যের খণ্ডন করে আস্তিক্যের মণ্ডন করা হয়েছে। কাজেই এখন আবার নাস্তিকদর্শনের দোহাই দেওয়া অহেতুক। তাৎপর্য এই যে চার্বাকাদি নাস্তিক দর্শনগুলির আলোচনা না করে বরং আধুনিক কম্যুনিজম, বিশেষ করে বস্তুবিজ্ঞান যে আপত্তি তুলেছে সে বিষয়েই বিশদ আলোচনা করা উচিত।

তবু তার্কিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন যে আস্তিক দর্শনের মধ্যেও ত ভেদ দেখা যায়। উদাহরণত সাঙ্খ্য বলেন আত্মা বহু, বেদান্ত বলেন এক। এক

সাঙ্খ্য মধ্যেই আবার ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ রয়েছে। আস্তিক দর্শন যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হত তালে সবদর্শন একই মত পোষণ করত। একাধিক দর্শনই সৃষ্টি হত না। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেই যখন পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে তখন এগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যাবে কিরূপে। এরূপ সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

চায়ং (ভেদং) দর্শনানাং প্রকারে—নতু ব্রহ্মনি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ : আস্তিক দর্শনের ভেদ প্রকারে, ব্রহ্ম বিষয়ে নহে।

Eoglish Translation —The theistic philosophies differ in kinds, not in the question of Brahma.

লীনিকা :—একথা অতি সত্যি যে আস্তিক দর্শনের মধ্যেও নানা বিষয়ে বিরোধ রয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিচার করলে দেখা যাবে এ ভেদ ভেদ নয়। আত্মা এক বললে যেমন ভুল হয় না, ঐহিকের পরিপ্রেক্ষিতে বহু বললে ও ভুল হয় না। অগ্নি একই। কিন্তু বিভিন্ন বর্তিকায় বহু বলেই মনে হয়। লাল, নীল, সবুজ, রং বেরঙের—বহু রকমের অগ্নিবর্তিকা আছে, তবু অগ্নি একই। নিরীশ্বর সাংখ্য (সাংখ্য) এবং সেশ্বরসাংখ্য (যোগ) ও একই। জ্ঞানে যতক্ষণ দ্বিত্ব ভাব আছে ততক্ষণ ঈশ্বর পৃথক। জ্ঞানে যখন আর দ্বিত্বজ্ঞান থাকে না তখন একমাত্র জ্ঞানই থাকে। একমাত্র জ্ঞানীদের নিকটই এ সত্য প্রকট। এজন্য তাদের কাছে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বা দর্শনে দর্শনে ভেদ দৃষ্ট হয় না। ভেদ কেবল দার্শনিকতায়। বস্তুত ব্রহ্ম বিষয়ে দর্শনে দর্শনে মতভেদ নেই, মুক্তি সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত। বেদের প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করে। জ্ঞান লাভই মুক্তি একথা সকলেই মানেন। কাজেই ভেদ কোথায়। কেবল বলার ভঙ্গি বিভিন্ন বলেই ভেদ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এ কথার স্বপক্ষে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করছেন—

ঈশ্বরবাদীতি দৃষ্টান্তঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ : দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরবাদীদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

English Translation :—Theologists may be cited for example.

লীনিকা :—এ সূত্র একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। দৃষ্টান্ত প্রমাণও নয় প্রমেয়ও নয়। তবু বুঝার ও বুঝাবার পক্ষে দৃষ্টান্ত উপযোগী বলে তা গ্রহণ করা হয়েছে। ঈশ্বরবাদীদের নিজেদের মধ্যে বহুভেদ দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরোপাসক হিন্দু, আল্লোপাসক ইস্‌লামী এবং গডোপাসক খৃষ্টানদের মধ্যে কত ভেদাভেদ রয়েছে। কিন্তু এ ভেদ ব্যক্তিদের মধ্যে। ঈশ্বরে ভেদ আছে কেউই বলে না। ঈশ্বরবাদী সকলেই স্বীকার করে যে ঈশ্বর এক এবং সর্বশক্তিমান। ঠিক তেমনি আস্তিক দর্শনের মধ্যে যে মতভেদ আছে সে ভেদ ব্যক্তির মধ্যে। ব্রহ্ম বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

দৃষ্টান্ত প্রমাণ বা প্রমেয় না হলেও বিচার ক্ষেত্রে একাধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় বিবেচনা করে সূত্রকার পুনরায় বলছেন—

শান্তিপ্রচেষ্টা চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ : আরও দৃষ্টান্ত, যেমন শান্তির প্রচেষ্টা।

English Translation :—The effort to establish peace in the world is also no less an example.

লীনিকা :—দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ সূত্র আধুনিক বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে এ আধ্যাত্মিক বিচারের যোগরক্ষা করার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক মনুষ্য আধুনিক কালের দৃষ্টান্তকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে বিবেচনা করেই এ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে সকলেই শান্তির জন্য চীৎকার করছে। ডেমোক্রেটরা শান্তি স্থাপনার প্রচেষ্টা করছে. কম্যুনিষ্টরাও। উভয়ের মধ্যে কত মতভেদ। উভয়ের পথ ভিন্ন, উপায় ভিন্ন, প্রস্তাবনা ভিন্ন। অথচ উভয়ের মধ্যে বিভেদ থাকলেও শান্তি বিষয়ে কিন্তু উভয়েই এক মত। এ যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি আস্তিক দর্শনের মধ্যে ভেদ থাকলেও ব্রহ্ম বা জ্ঞান বিষয়ে সকলেই এক মত। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

শুধু আস্তিক দর্শনে আস্তিক দর্শনে নহে, আস্তিক দর্শনের সঙ্গে নাস্তিক দর্শনেরও ঐক্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন—

নাস্তিকত্বাৎ আস্তিকো হি ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ : এমন কি নাস্তিক মতগুলি প্রকারান্তরে আস্তিক্যকেই স্বীকার করে।

English Translation :—Even the athestic doctrines, support the theistic opionions.

টীনিকা :—কথাটা অদ্ভুত এবং অসম্ভব মনে হতে পারে। এর মধ্যে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। যারা নাস্তিক বলে নিজেদের জাহির করে, ভেতরে ভেতরে তারাও আস্তিক। কম্যুনিষ্টরা যতই কেপিটেলিষ্টদের নিন্দা করুক না কেন ভেতরে ভেতরে তারা কেপিটেলিষ্ট। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই ; যারা অবিশ্বাসী তারাও বিশ্বাস করে। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চার্চে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন তখন ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে তিনি চার্চে যেতে পারেন না। তিনি চার্চে গেলে দেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না। তিনি অবিশ্বাসী। অথচ তাঁর অবিশ্বাস জ্ঞাপনের মধ্যেই যে পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে একথা সত্য। অবিশ্বাসের অর্থ কি ? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, অর্থাৎ ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর নেই হলে চার্চেও নেই। তা'হলে যেমন হোয়াইট হাউস তেমনি চার্চ, তেমনি রাষ্ট্রপতির বাড়ী। ক্রুশ্চেভ যদি হোয়াইট হাউসে যেতে পারেন তালে চার্চেও যেতে পারেন। কিন্তু তিনি যান নি। তিনি মনে করেছিলেন চার্চে যাওয়া হলে ঈশ্বরের সম্মুখে যাওয়া হয়। ঈশ্বরের সামনে গিয়ে পড়লে দেশে ফিরে এসে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে নাস্তিক মতগুলোও আস্তিক্য অস্বীকার করতে পারে না।

কি ভাবে ?—তদুত্তর প্রদান কল্পে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করেছেন

দেহে চৈতন্যসংযোগাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ :—দেহে চৈতন্যসংযোগ আছে—একথা থেকেই তার অনুমান হয়।

English Translation :—That the atheists also are the believers in theism is evident from their avowal that body is conjoined with sense.

লীনিকা:—ঘোর নাস্তিকও এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না যে দেহে চৈতন্যের সংযোগ আছে। দেহে চৈতন্য থাকা এবং চৈতন্য না থাকার তফাৎ অতীব প্রত্যক্ষ। চৈতন্য যে আছে এবং এ চৈতন্য দেহাতীত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মৃত অবস্থায় দেহ থাকে অথচ চৈতন্য থাকে না। অগ্নি থেকে উত্তাপ পৃথক হয় না, কিন্তু দেহ থেকে চৈতন্য পৃথক হয় বলেই চৈতন্য দেহাতীত। চৈতন্য যে দেহের সৃষ্টি নয় এ বিষয়ে আর পৃথক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কম্যুনিষ্টদর্শন যে বলে মন অর্থাৎ চিন্তা (thought) মস্তিস্কের সৃষ্টি তালে মস্তিস্ক থাকলেই চিন্তা থাকা উচিত ছিল সদ্য মৃত ব্যক্তির মস্তিস্ক অবিকল থাকে তথাপি চিন্তা থাকে না। মস্তিস্কের বর্তমানেও যদি চিন্তার অবর্তমানতা থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিন্তাটা মস্তিস্ক প্রসূত নহে। সাধারণ লজিক। ঘুমন্ত মস্তিস্ক ও চিন্তা করতে পারে না। কাজেই চিন্তা যেমন মস্তিস্কের সৃষ্ট নহে চৈতন্য ও দেহের সৃষ্ট নহে। কাজেই চৈতন্য দেহাতীত। এ চৈর্তন্য দেহসৃষ্টির পূর্বে ছিল কি না, মৃত্যুর পরও চৈতন্য থাকে কি না তা পরে বিবেচনা করা যাবে; চৈতন্য যে আছে, এবং দেহে চৈতন্য সংযোগ থাকার যে এক বিশেষত্ব আছে—যা থাকা না থাকা জীবন মরণ প্রভেদ—একথা যখন নাস্তিকরাও মানেন তখন আস্তিক্যে তাদের ও বিশ্বাস আছে; চৈতন্য বিষয়ে সকলেই আস্তিক। ভেদ কেবল চৈতন্যের স্বরূপ বিষয়ে।

এরূপ আস্তিক্যের সার্বজনীনতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা প্রদর্শন করে সূত্রকার বর্তমান সূত্রের স্বপক্ষে পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করে বলছেন

নির্বাণম্ ভ্রান্তেঃ দীপস্য—মোক্ষায়॥ ১৬॥

সূত্রার্থ:—বুদ্ধদেব যে নির্বাণের কথা বলেছেন আসলে তা মোক্ষের জন্য ভ্রান্তিদীপেরই নির্বাণ।

English Translation : The term Nirban as prophesied by lord Buddha does not mean annihilation of wisdom ; it only means extinction of the lamp of delusion for purpose of attaining the final emancipation of the soul.

লীনিকা: বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভের উপদেশ প্রদান করে গেছেন। এ নির্বাণের

অর্থ জ্ঞানের নির্বাণ বা আত্মার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নহে। নিঃশেষ কি কোন কিছু হতে পারে? বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্বাণ বলতে ভ্রান্তিদীপের নির্বাণের কথাই বুঝতে হবে। ভ্রান্তির নির্বাণ বা অবসান হলে তবেই জ্ঞান লাভ, তবেই মুক্তি। অন্ধকার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলো বর্তমান নেই, এ যেমন সত্য তেমনি ভ্রান্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জ্ঞান বর্তমান নেই তাও সত্য। কাজেই জ্ঞান লাভ করতে হলে ভ্রান্তিদীপের নির্বাণ প্রয়োজন। ভ্রান্তিই দুঃখের কারণ। দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ভ্রান্তির অপসারণ প্রয়োজন।

এখানে তর্ক আসতে পারে যে ভ্রান্তি হল অন্ধকার জ্ঞাপক, দীপ প্রকাশ-বর্তিকা। কাজেই ভ্রান্তির দীপ—এরূপ প্রয়োগ ত অসঙ্গত। কারণ পরস্পর বিপরীত ধর্মী শব্দ সমানার্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। এর উত্তরে বলতে হবে যে এখানে ভ্রান্তির দীপ এরূপ প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। ভ্রান্তি জ্ঞানের একটি অবস্থা। জ্ঞানের যে অবস্থায় ভ্রান্তি বিরাজিত তাই জগদ্‌জ্ঞান। জীবের নিদ্রাবস্থাই যথার্থ অজ্ঞানতা। সে অবস্থায় জগদ্‌জ্ঞানও থাকে না। সে অজ্ঞানবস্থাই অন্ধকার। জীবের জাগ্রত অবস্থায় সে অন্ধকার থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় জীব অজ্ঞানও নয়; কারণ তখন তার জগদ্‌জ্ঞান থাকে। কিন্তু এ জগদ্‌জ্ঞান ও স্বরূপজ্ঞান নয়। এতেই থাকে ভ্রান্তি। ভ্রান্তিতে জগদ্‌জ্ঞান থাকে বলেই তাকে দীপের সঙ্গে উপমা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এ ভ্রান্তির দীপ দিয়েই মানুষ জগৎ অবলোকন করছে। তাতে তারা দুঃখ পাচ্ছে। যতদিন এদীপ দিয়ে মানুষ চলবে ততদিন দুঃখও থাকবে। কাজেই দুঃখ থেকে নিষ্কৃত পেতে গেলে এ ভ্রান্তিদীপ নিভিয়ে দিতে হবে। স্বরূপজ্ঞানের দীপ প্রজ্জলিত হলেই দুঃখের অবসান। দুঃখের অবসানের নাম নির্বাণ। ইহা নেতি বাচক নহে। স্বরূপজ্ঞান ত আছেই।

নাস্তিক্যে আস্তিক্যের স্বীকার প্রদর্শন করে সূত্রকার আস্তিক দর্শনের মধ্যে কেন ভেদ পরিলক্ষিত হয় তার কারণ বর্ণনা করে সূত্র স্থাপন করছেন

ভেদঃ ভাষাবিভেদাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ :—আস্তিক দর্শনে যে ভেদ সে ভেদ কেবল ভাষাভেদ থেকে হয়।

English Translation :—The dissension among the various theistic philosophical opinions is due to language differences only.

লীনিকা :—আস্তিকদর্শনে ভেদ পরিলক্ষিত হয় বলে প্রতিপক্ষের যে তর্ক উপস্থিত করা হয়েছে তার প্রত্যুত্তরে বলা হচ্ছে যে এ ভেদ ভাষার ভেদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কেবল বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মত সম্বন্ধে বলা যায় যে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত রহিত—এ সব শব্দগুলি বিভিন্ন-ভাবে বলা হলেও তাৎপর্য একই। অদ্বৈত যা বিশিষ্টাদ্বৈতও তাই। দ্বৈতকে আবার অদ্বৈত বললে তাও অদ্বৈতই। আবার দ্বৈতাদ্বৈত রহিত যা তা অদ্বৈত ছাড়া আবার কি। আসলে বস্তু একই; তাকে বলতে গিয়ে প্রত্যেকে তার নিজের মত বলে। আর নিজের মত বলতে গেলেই বিভিন্নতা এসে পড়ে। কখন কখন অপরের কথা মুখস্থ করে বলা যায় বটে, কিন্তু সেত অপরের ভাষা। নিজের ভাষায় কোন একই বস্তুকে প্রকাশ করে বলতে গেলে ভাষা পৃথক হয়ে পড়ে বলেই কখন কখন ভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মূলত তাতে কোন ভেদ নেই।

ভাষায় বলতে গেলে কেন এরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয় তার কারণ প্রদর্শন করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র প্রদান করছেন

ভাষা কল্পনাযোগাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ :—কল্পনা যোগে ভাষা সৃষ্টি হয়, এ জন্য,

English Trnslation : Because language is a product of contrivance, therefore.

লীনিকা : যে বস্তু যা নয় তাকে তদ্‌বস্তু মনে করার নাম কল্পনা। কল্পনা মনের কাজ মাত্র। মন কল্পনা করে বুঝবার জন্য। ইন্দ্রিয়যুক্ত মন যখনই যে বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখনই সে সে বিষয়কে বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন কল্পনার সাহায্যে বিষয়ের স্বরূপ বুঝতে পারে না বলে তাতে আরোপ করে তার স্বকল্পিত সংজ্ঞা এবং স্বকল্পিত সংজ্ঞানুরূপই সে তখন বুঝে। এরূপ মানুষ সংজ্ঞা দিয়েছে এটা মানুষ, ওটা গাছ, এটা অমুক সেটা তমুক। আর সংজ্ঞানুরূপ সে বুঝে। এ সংজ্ঞাই ভাষা। মানুষের সকল বুঝ তার ভাষায়। ভাষা ছাড়া আর মানুষের বুঝবার কোন উপায় নেই। ভাষা দিয়েই মানুষ বুঝে আর মনে করে বুঝই তার জ্ঞান।

প্রকৃত পক্ষে বস্তুর সঙ্গে কল্পিত ভাষার কোন সম্বন্ধ নেই। যে ভাষায় যে

বস্তুকে আমরা যা বুঝি সে বস্তু তা নয়। ভাষা বা সংজ্ঞা বস্তুর স্বরূপ হলে সংজ্ঞা থেকেই বস্তুর জ্ঞান সকলেরই জন্মাত। কিন্তু সংজ্ঞা থেকে জ্ঞান জন্মায় না। 'মানুষ' সংজ্ঞায় ভারতবাসী যা বুঝে, ইউরোপবাসী তা বুঝে না। সে বস্তুকে বুঝবার জন্য তারা অন্য সংজ্ঞা প্রয়োগ করে। সে সংজ্ঞা (যেমন ইংরাজদের Man) তাদের কল্পিত। কাজেই ভাষা যে কল্পনার সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। আর এ সৃষ্টি বুঝবার জন্য।

এখন ভাষার ব্যবহার কেন করা হয় সে প্রসঙ্গে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র অবলম্বন করে বলছেন

বিজ্ঞাপনায় ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থঃ অপরকে জানাবার এবং বুঝাবার জন্যই ভাষার ব্যবহার। English Translation :—Language is used to make others to understand.

টীকাঃ প্রথমতঃ বুঝবার জন্যই মানুষ ভাষার কল্পনা করেছে। আবার অপরকে বুঝাবার জন্যই মানুষ কল্পিত ভাষায় ব্যবহার করে। পূর্বেই বলা হয়েছে বস্তুর সঙ্গে ভাষায় কোন সম্বন্ধ নাই—ভাষায় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয় না। অথচ ভাষা ভিন্ন মানুষ বুঝে না। ভাষা দিয়েই বুঝে। আবার ভাষার বুঝও স্ব স্ব কল্পনার অনুরূপ হয়। এজন্য মানুষের বুঝের মধ্যেই পার্থক্য থেকে যায়। একজন যা বুঝে অপরের বুঝের সঙ্গে তার পার্থক্য হয়। আবার তাই যখন অপরকে বুঝানো যায় তখন তার পার্থক্য আরও বেড়ে যায়। এরূপে সৃষ্টি হয় ভেদ। দর্শনাদিতে যে ভেদ দেখা যায় এ ভেদ ভাষার—বুঝের বা বুঝানোর। এভেদ জ্ঞানের নয়। যতদিন বুঝাবুঝি থাকবে ততদিন বিভেদ থাকবে। কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান হয়ে গেলে আর ভেদ থাকবে না, সকলই যে অভেদ তা একমাত্র অভেদ-জ্ঞানেই উপলব্ধি করা যায়।

বলার ভঙ্গিভেদের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যেও ভেদ দেখা যায়। যেমন ions বা electrons এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে—

(১) ফেরাডে (Faradey) বলেন, "atoms are ultimate centres of energy";

(২) কেলভিন (Lord Kelvin) বলেন, "they (atoms) are vortex rings in the ether which is perfect fluid";

(৩) অন্যান্যরা (Ostwald and others) বলেন,—atoms are extremely complex system or reservoirs of equilibriated forces. ইত্যাদি।

এখানে দেখা যায় একই অণুর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে যাচ্ছে। অণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান একই। বিজ্ঞানে কোন বিভেদ নেই। বিভেদ ভাষায়। তেমনি আস্তিকদর্শনে যে ভেদ তা ভাষার ভেদ মাত্র, তত্ত্বে বা সত্যের বা জ্ঞানের ভেদ নহে।

এবার বস্তু-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সূত্রকার ব্রহ্মের উল্লেখ করে পরবর্তী সূত্রের সংযোজনা করছেন

ব্রহ্মতত্ত্বং তু বিজ্ঞেয়ং—ন তু বিজ্ঞাপনীয়ম্॥ ২০ :

সূত্রার্থ :—ব্রহ্ম জানবার মত তত্ত্ব, জানাবার বিষয় নহে।

English : Brahma the Absolute spirit is a Primitive Truth to realise not a thing to make others to know.

লীনিকা : প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জানার তত্ত্ব, অপরপক্ষে জানাবার নয়; কেন না ব্রহ্ম জানানো যায় না। ব্রহ্ম কোন বিষয় নহে। যা বিষয় নয় তা বুঝা যায় না, যা বুঝা যায় না তা অপরকে বুঝানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ও অপরকে বুঝানো যায় না। গেলে সকলেই এক বিষয় একই ভাবে বুঝতে পারত। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায় একজন যে বস্তু একভাবে বুঝে অপরজন তা অন্যভাবে বুঝে। ব্রহ্ম বিষয়াতীত। বুঝ দিয়ে বুঝবার কোনই উপায় নেই। যা বুঝবার উপায় নেই তা অপরকে বুঝানো বা জানানো যায় না। তবে ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। একমাত্র জ্ঞান দিয়ে জানা যায়। জানতে গেলে একইভাবে জানা যায়। আগুনে হাত দিলে আগুনের তাপ সম্বন্ধে সকলের একইভাবে জ্ঞান হবে। এতে কোন বুঝাবুঝি নাই। যার ভাষা নেই, মূক, তারও আগুনের জ্ঞান একই হবে। কারণ যা সত্য তার অনুভূতি সকলের নিকটই এক। ব্রহ্ম জানাবার বিষয় নয়, জানবার বিষয় বলেই সূত্রকার ব্রহ্ম জানার উপায় বিচারে ব্রতী হয়ে আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসা প্রণয়নে রত হন।

এক্ষণে ব্রহ্ম কেন কেবল জানবার মত তত্ত্ব, জানাবার বিষয় নয় এর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপন করেছেন

অব্যক্তত্বাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ :—ব্রহ্ম অব্যক্ত বলে ব্যক্ত করা যায় না।

English Translation: The Supreme Spirit being inexpressible cannot be expressed in words.

লীনিকা: ব্রহ্মকে কিছুতেই ব্যক্ত করা যায় না। কেন না ইহা অব্যক্ত অবস্থা। এ অব্যক্ত অবস্থাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে ত বিভেদ আসবেই। বাস্তবিক পক্ষে কোন কিছুই ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। মধু মিষ্টি। এ মিষ্টতা কি ভাবের তা ভাষা দিয়ে কিছুতেই অপরকেই বুঝানো যায় না। মধুপায়ী দুজন হলে, অর্থাৎ মধু পান করে মধুর স্বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে এমন দুজন হলে একজন আর একজনকে মধুর স্বাদ বলে বুঝাতে পারে কিন্তু তবু ভাষা দিয়ে মিষ্টত্ব দান করতে পারেনা। যে কোন দিন মধু পান করে নি তাকে কোন অবস্থায়ই মধুর স্বাদ বুঝানো যাবে না। তা সম্ভব হলে মানুষ ভাষা দিয়েই সবস্বাদ মিটিয়ে নিতে পারত। বস্তু বা বিষয়ের আর কোন অভাব হত না। ভাষায় শুধু বিষয়ের এক স্মৃতি মনে জাগে। বিষয় প্রাপ্তির এক কামনা মনে জাগে। এ কামনার মধ্যেও সুখ আছে—যদিও এ সুখ দুঃখের রূপান্তর। এ জন্য বিষয় ভোগের কথা বলায় মানুষ এত সুখ পায়। কিন্তু তাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ভাষায় তৃপ্তি হচ্ছে না বলেই মানুষ বস্তুই চায়। বস্তুর জ্ঞান বস্তু দিয়েই হতে পারে ভাষা দিয়ে হয় না। ঠিক তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানও ভাষা দিয়ে হয় না। তা'হলে একবার ব্রহ্মসূত্র পড়ে নিলেইত ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যেতো। ব্রহ্মজ্ঞানী দুজন হলে ব্রহ্মের কথায় দুজনই বুঝতে পারে। কিন্তু যার ব্রহ্মজ্ঞান নাই তাকে ব্রহ্ম বুঝানো কিছুতেই যাবে না—কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাকে তা বলাই যাবে না, বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম বুঝাতে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞরাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আর এজন্য দেখা দেয় প্রভেদ। কিন্তু এ প্রভেদ বিভেদ নয়।

এতক্ষণ আস্তিক দর্শনে কেন বিভেদ দৃষ্ট হয়, মূলত কোন বিভেদ নেই, বিভেদ শুধু ভাষার, এরূপ সিদ্ধান্ত করে পুনরায় বস্তু বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদান করার জন্য সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করে বলেছেন

বস্তুবিজ্ঞানং জড় জগতি—নতু তত্ত্ববিষয়ে ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ ঃ—আধুনিক বস্তু বিজ্ঞান জড়জগৎ নিয়ে আলোচনা করছে, তত্ত্ব জগতের কিছুই জানে না।

English Translation : The modern material science is concerned with the inanimate world, it knows nothing about metaphysics, spiritual truth.

লীনিকা ঃ এবার বস্তুবিজ্ঞানঅবলম্বিত প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদান করা হচ্ছে। বস্তুবিজ্ঞানই বর্তমানে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বলা হয়। মনোনিবেশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে দু এর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। বস্তুবিজ্ঞান জড়বস্তুর উপর গবেষণা করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান তত্ত্ব বা সত্য নিয়ে মেতে আছে। দুটার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজেই দুএর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতেই পারে না। তবু এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বিজ্ঞান কি জানে না, কেবল বিজ্ঞানের কতকগুলি আশ্চয আশ্চর্য আবিষ্কারের খবর কাগজে পড়ে বস্তুবিজ্ঞানকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিকতা নাই—ব্রহ্ম বলে কিছু নাই এরূপ জাহিরও করেছে। যারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, উচ্চস্তরের বিজ্ঞান পড়েছেন, গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করছেন তারা কিন্তু এসব বলেন না। জগদীশ বসুর মত বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র থেকেই সন্ধান পেলেন উদ্ভিদ এমন কি জড় বলে আমরা যাকে জানতাম তারও চেতন আছে, সুখ দুঃখ আছে। অথচ খবর পড়া অবৈজ্ঞানিকেরা শাস্ত্রকে মানতে রাজী নয়। যেন জগদীশবসুর চেয়ে ও তারা বেশী বৈজ্ঞানিক —জ্ঞানী। তা তারা তাদের জ্ঞান নিয়ে থাক। তারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে বিবাদ করুক। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা কিন্তু আনাড়ীদের মত গোড়া নন। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনও জ্ঞান সম্বন্ধে তাদের সংশয় নিঃসংকোচে স্বীকার করেন। তারা বলেন, "বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমা Thus far, no further". আধুনিক বিজ্ঞান এখনও জড়ত্বের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি; তাই চেতন সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করার অনধিকারী।

কিন্তু জগতের নিয়ম তাই, যারা অনাধিকারী তারাই চর্চা করে অধিক। এরূপ অনাধিকারীদের প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার বলছেন

স তু নির্মিতৌ, ন তু সৃষ্টৌ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ: বস্তু বিজ্ঞান নির্মাণের ব্যাপারে বিজ্ঞ বটে, কিন্তু সৃষ্টি ব্যাপারে এখন ও অজ্ঞই।

English Translation :—The material Science has got complete mastery over construction, but it is quite ignorant in the matter of creation.

লীনিকাঃ এ কথা ঠিক, বিজ্ঞান বহু নূতন জিনিস নির্মাণ করেছে—রেডিও টেলিভিশন, এটমবম, রকেট, স্পুটনিক, লুনিক পর্যন্ত। নির্মাণই তার আবিষ্কার। তাৎপর্যের দিক থেকে দেখতে গেলে ধনুকের আবিষ্কার আর রকেটের আবিষ্কার একই কথা। কিন্তু বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তৃণ হেন বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে নি। যা আছে তা দিয়ে এটা ভাঙিয়ে ওটা নির্মাণ করা চলে। কিন্তু যা নাই তা সৃষ্টি করা চলে না। কাজেই 'নাই' বলে কোন কিছুই হতে পারে না। আছেই। আত্মা আছেই, ব্রহ্মও আছেই। বিজ্ঞানই বলে কোন বস্তু ধ্বংস হয় না, তবে আত্মার ধ্বংস কিভাবে হবে। কাজেই আত্মা থাকবে না একথা বিজ্ঞান বলতেই পারে না। কাজেই বস্তু-বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে অস্বীকার করতেই পারে না। বস্তুবিজ্ঞান তার নির্মাণের সীমায়ই কর্তৃত্ব করতে পারে, সৃষ্টির ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু জানে না।

তবু জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান মতই সর্বজন গ্রাহ্য। তাই এ মত সম্বন্ধে সূত্রকার বলছেন

অনুমানাদ্ ভ্রান্তি নির্ণয়ঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ: সৃষ্টি ব্যাপারে বিজ্ঞানের অনুমাননির্ণয় ভ্রান্তিজনক।

English Translation :—The hypothetical and analogical conclusions of modern Science in regard to the creation are fallacious

লীনিকা: বর্তমানে সর্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতই সর্বজন গ্রাহ্য। জগৎ ও

জীব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়েও বৈজ্ঞানিক মতই সকলে মানে। বিজ্ঞানও যথাসাধ্য সব জিনিষের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে মানুষের জানার তৃষ্ণা মিটাবার চেষ্টা করছে। বহু ব্যাপারে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে বলেই তার এরূপ সর্বজনগ্রাহ্যতা। বস্তুত বস্তুবিষয়ে বিজ্ঞানের মতকে অস্বীকার করার উপায়ও নেই।

কিন্তু এর মধ্যে একটা বিশেষ কথা লক্ষ্য করবার আছে। জগতের প্রত্যেক বস্তু স্থান (space) এবং কালে (time) ব্যাপ্ত। বিজ্ঞান স্থানের উপর কিছু অধিপত্য বিস্তার করেছে বটে, করতে পেরেছে কারণ স্থানটা ভূত-পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কালের উপর বিজ্ঞানের কোন দখল নেই, অন্তত এ পর্যন্ত নেই। বস্তুবিজ্ঞান বর্তমানকে অতিক্রম কিছুতেই করতে পারে না—অন্তত আজ পর্যন্ত পারে নি। কাজেই অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বিজ্ঞানকে বর্তমান তথ্যের (Data) উপর নির্ভর করে অনুমান করে বলতে হয়। অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাতে ভ্রান্তি থাকা সম্ভব। সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের যে অনুমাননির্ণয় তা ভ্রান্তিজনক।

দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে সহজে কেউ কোন কথা মানতে চায় না বলে এ প্রসঙ্গে সূত্রকার নিজেই একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন

দৃষ্টান্তঃ পৃথিব্যাকারঃ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ : পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতই তার দৃষ্টান্ত।

English Translation : Opinion of Science as regards the shape of the earth may be cited for instance.

লীনিকা : বিজ্ঞানের স্থানের উপর যে অধিকার তাও সন্দেহপুর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৃথিবীর আকারের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে নানারূপ প্রমাণাদির সাহায্যে বিজ্ঞান এতদিন বলে আসছিল পৃথিবী কমলা লেবুর মত গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিত চাপা। এ বৈজ্ঞানিক সত্যটি শিখবার জন্য স্কুলের ছেলে মেয়েরা কত যে নাজেহাল হয়েছে, অনেকে হয়ত পরীক্ষায় ফেলও করেছে। আজ আবার বিজ্ঞানই বলছে পৃথিবীর আকার একদিক উঁচুবিশিষ্ট (earth is conic shaped), ইহার উত্তর দিক উঁচু। এতদিন পর বিজ্ঞানের এক ভ্রান্তি তবু ঘুচল। কারণ প্রাচীন শাস্ত্রে পৃথিবীর আকার "করতলকলি-

তামলকীবদমলং বিদন্তী যে গোলং” যেরূপ বলা আছে এতদিন পর বস্তুবিজ্ঞান তা মেনে নিল। করতলে অবস্থিত আমলকির আকারই যথার্থ conic shape এর। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক মতও যে ভ্রান্ত হতে পারে একথা আর অস্বীকার করার উপায় নাই। এ প্রসঙ্গেই সূত্রকার দৃষ্টান্তান্তর প্রদান করছেন

অয়নঞ্চ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ : এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর অয়ন অর্থাৎ গতিকেও দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

English Translation :—The revolution or the annual movement of the earth may also be taken for example.

লীনিকা : পৃথিবীর দুটি গতি আছে—আহ্নিক এবং বার্ষিক। নিউটনের মতে পৃথিবী বছরে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। কারণ সূর্যাত্মজা পৃথিবী স্বগতিবশে সূর্যের আওতার বাইরে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত, অথচ সূর্য তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়, নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখছে। এই দুই বিপরীতমুখী গতির ফলে পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরে ফিরতে হচ্ছে। আইনষ্টাইন কিন্তু এমত ভুল বলেছেন। তিনি বলেন প্রকাণ্ড স্থূলকায় বস্তুর (Massive body) সান্নিধ্যে আকাশ বক্র হয়ে যায়। সূর্য-সন্নিহিত আকাশ বক্র। কাজেই আকাশে পৃথিবীর যে পথ তাও বক্র। বক্র পথে চলে বলে পৃথিবী বৃত্তাকার পথে ঘুরে। বৈজ্ঞানিক মত হলেই তা নির্ভুল হলে বিজ্ঞানই বিজ্ঞানকে ভুল বলে কেন? কেন না বিজ্ঞানের ভুল হয়! সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের যে মত তা ভ্রান্তিজনক।

এরূপে প্রতিপক্ষের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপক্ষের প্রবোধনার্থ সূত্রকার বলছেন

জগৎ সৃষ্টিরনির্ণীতা ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ : বস্তুবিজ্ঞান এখন ও জগৎ সৃষ্টির রহস্য সম্পূর্ণ নির্ণয় করতে পারেনি ;

English Translation :—The mystery of creation of the univese is not yet revealed to the material Science.

লীনিকাঃ একথা সত্য, বস্তুবিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছে এবং বহু অন্বেষণের ফলে বহু তথ্য আবিষ্কার ও করেছে। বস্তুজগতের বস্তুকারণ ও তৎকার্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনেক সত্যের আলোকপাত করেছে। কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে বস্তুই সব নয়। বস্তুর যা কারণ তাই সৃষ্টির মূল। বস্তুবিজ্ঞান সে কারণে আজও পৌছতে পারে নি। এ জন্য সৃষ্টির রহস্য ও জ্ঞাত হতে পারে নি। তাই বলা হয়েছে বস্তুবিজ্ঞানের নিকট সৃষ্টিতত্ত্ব এখনও অজ্ঞাত বলা যায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে বাইবেল আদি ধর্মগ্রন্থে বিশ্বসৃষ্টি যেভাবে বর্ণনা করা আছে, ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে, সে সব মত ত অচল। বিজ্ঞান সব নাকচ করে দিয়েছে। এবং স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাজেই বিজ্ঞান-মতই একমাত্র গ্রাহ্য। তদুত্তরে বলব যে বাইবেলের মত নাকচ করেছে বলেই বিজ্ঞানের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এরূপ কোন কথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এখানে ত বলা হচ্ছে বিজ্ঞানের মতই অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞান সৃষ্টির ব্যাপারে সব কিছু এখনও অবগত হতে পারে নি। কেন অবগত হতে পারে নি তার হেতু প্রদর্শনার্থ সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতের উল্লেখ করেই সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করছেন

নেবুলারম্ প্ল্যানেটেসিমালঞ্চ অনুমানং হি ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থঃ নেবুলার ও প্ল্যানেটেসিমাল সূত্র দুটি অনুমান মাত্র।

English Translation :—Both the Nebular and the Planetasimal theories are only hypotheses.

লিনীকাঃ জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রসিদ্ধ—একটিকে বলে নেবুলার, অপরটিকে বলে প্ল্যানেটেসিমাল। নেবুলার সূত্র অনুসারে বলা হয় নীহারিকা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রহউপগ্রহ সমন্বিত সৌরজগৎ। তা'হলে আবার প্রশ্ন আসে, নীহারিকা কি আদি কারণ ? যদি না হয় তা'হলে নীহারিকা সৃষ্টি হল কোথা থেকে ? নেবুলার সূত্রে এর উত্তর নেই। আবার প্ল্যানেটেসিমাল সূত্র অনুসারে বলা হয় যে পূর্বে গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্যের দেহেই ছিল। পরিক্রমারত সূর্য আর একটি বিরাট নক্ষত্রের পাশে উপস্থিত হলে সে নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের দেহ থেকে কয়েকটি টুকরা ছিটকে পড়ল। সেগুলিই গ্রহ।

আবার গ্রহ থেকে এরূপেই সৃষ্টি হল উপগ্রহ। তাহলে প্রশ্ন: সূর্য এবং বৃহৎ নক্ষত্রটিই কি সৃষ্টির আদি? যদি না হয় তাহলে এগুলির সৃষ্টিই বা হল কি করে? কেনই বা সূর্য ঘুরতে আরম্ভ করল? কেন বৃহৎ নক্ষত্রটি তাকে আকর্ষণ করে ভেঙ্গে দিল—এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব প্ল্যানেটেসিমাল সূত্রে নাই। এ দুটি সূত্রই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমানের উপর বলা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ যা, নেবুলার প্লানেটেসিমাল সূত্রও তাই। কেউ একটা মানে কেউ অপরটা মানে এই মাত্র তফাৎ। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বিজ্ঞানের এ আনুমানিক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ বলে গ্রহণ করতে পারে না। সৃষ্টি বিষয়ে শৈশবে ঠাকু'মার নিকট গল্প শুনে যা জ্ঞান হয় এ সূত্র দুটি তার চেয়ে বেশী জ্ঞান দান করে না।

সৃষ্টি বিষয়ে আরও বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে। সে মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করছেন

আইনষ্টাইনস্য অসম্পূর্ণঞ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ: আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক সূত্র অসম্পূর্ণ।

English Translation : The Relativity theory of Einstein is also incomplete.

লীনিকা: আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক সূত্র বিজ্ঞান জগতে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সূত্র খুবই ব্যাপক। এ বিষয়ে সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুর উল্লেখ এখানে করা গেল। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক সূত্র মতে সৃষ্টির সব কিছু আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই। Absolute space বা absolute matter বলে কিছু নেই। যদি matter না থাকত তাহলে space বলে কিছু অনুভবে আসত না। আবার space না থাকলে matter এর পরিধিও পাওয়া যেত না। মোট কথা, জগতের সব কিছু Relative ; absolute বলে কোন কিছু নেই। আইনষ্টাইনের একথা ভ্রান্ত। জাগতিক পরিবেশে সব কিছু আপেক্ষিক বটে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জগতের উর্ধ্বে জগদাতিরিক্ত আরও কিছু আছে। আইনষ্টাইন তার সন্ধান পান নি। কাজেই তার আপেক্ষিক সূত্র অসম্পূর্ণ।'

কেন অসম্পূর্ণ তার কারণ নির্ণয়ার্থ সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

পঞ্চমম্ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থঃ পদার্থের পঞ্চম পরিমিতি (Dimension) আছে।

English Translation —There is the fifth dimension too

লীনিকা: আইনষ্টাইনের মতে জড়ের পরিমিতি চারটি—দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ, তার সঙ্গে কাল (time) বা স্থান (space) কিন্তু যা নাই তার এ চার পরিমিতি থাকার প্রশ্নও আসে না। কাজেই অস্তিত্ব বা অস্তিতা পদার্থের পঞ্চম পরিমিতি। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক সূত্রে অস্তিতার ব্যাখ্যা নাই বলেই তা অসম্পূর্ণ।

কেবল জড় নিয়েই ত জগৎ নয়। জগতে জীবও আছে। জীব বলতে কি বুঝায়—এর উত্তর প্রসঙ্গে সূত্রকার বলছেন

চেতনা জীবলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থঃ চেতনাই জীবের লক্ষণ

English Translation Consciousness is the sign of life.

লীনিকা: আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কেবল জড়কে নিয়েই কাল কাটিয়েছেন। সৃষ্টিতে জীবও যে আছে এ বিষয়ে তারা যেন মোটেই সচেতন নন। থাকলে তারা দেখতে পেতেন যে জীবেরও একটি বিশেষ গুণ আছে, সেগুণ হল চেতনা। চেতনার বিষয় পরে আলোচনা করা হবে। আইনষ্টাইন যে বলেছেন absolute বলে কিছু নাই, সব কিছুই relative এ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করার জন্য সূত্রকার পরবর্তী সূত্র প্রতিষ্ঠা করছেন

নির্ব্যাপকত্বাৎ ব্রহ্মনিরপেক্ষম্ ॥ ৩২ :

সূত্রার্থঃ ব্রহ্ম নির্ব্যাপক অর্থাৎ নির্গুণ বলে নিরপেক্ষ।

English Translation : The Supreme Spirit Brahma is above all dimensions and as such Absolute.

টিকা: এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পদার্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পদার্থের পঞ্চম পরিমিতি আছে তা হল অস্তিতা। জীবের তদতিরিক্ত আরেকটি লক্ষণ হল চেতনা। কিন্তু তারা ব্যাপক বলে আপেক্ষিক। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ।

লীনিকা : বিজ্ঞানজগতে আইনষ্টাইনের অবদান অতুলনীয়। জগতের নিয়ম সম্বন্ধে মহাবিজ্ঞানী যা বলে গেছেন ততটুকুতে কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞান, আগেই বলা হয়েছে, কাল (time) ও স্থান (space) এর সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কাল ও স্থানের পরপারে, বস্তুবিজ্ঞান সেখানে পৌছতে পারে না, তাই নিরপেক্ষ কোন সত্য আছে তা ধারণা করতে পারে না। কিন্তু আছে নিরপেক্ষ এক সত্য আছে। যে সত্যে উপনীত হলে কাল ও স্থান ভেদ থাকে না! সে সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কোন গুণ নাই। তাই নিরপেক্ষ। সময় কি? পৃথিবী একবার আবর্তন করছে এটুকুকে আমরা বলি এক দিন সময়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসছে এটুকুকে আমরা বলি এক বৎসর সময়। এর ভিত্তিতে আমরা গণনা করছি একশ, হাজার, লক্ষ, কোটি, কোটি কোটি বৎসর। আচ্ছা মনে করি, পৃথিবী যদি না ঘুরত তাহলে এ সময়ের হিসাব কোথায় পেতাম? আবার দেখা যায়, পৃথিবীর সময় ও মহাকাশের সময় এক নয়। আইনষ্টাইনই দেখিয়ে গিয়েছেন যে কেউ যদি কুড়ি বছর মহাকাশ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে সে দেখবে লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। বহু প্রাচীন কালে এ ভারতের ঋষিরাই বলে গিয়েছিলেন যে নরের ষাট হাজার বছরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত। পাশ্চাত্যের অনুকরণকারীরা (হায়, যদি এরা পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে পারত, তবু ভাল হত। কেবল অনুকরণ করতে গিয়ে নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিচ্ছে) এসব কথা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আইনষ্টাইনের কথা কতটুকু তারা বুঝতে পারে আমি জানি না। না বুঝলেও উড়িয়ে দিবে না আশা করা যায়। যাকগে। এখন কথা হল পৃথিবীর সময়ই মহাকাশে যদি লক্ষ লক্ষ গুণ কমে যায় তা'হলে এমন কোথাও যে সময় একেবারে লোপ পেয়ে যেতে পারে তাতে আশ্চযের বা অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে। আছে। সে অবস্থাও আছে। তার নামই ব্রহ্ম বা জ্ঞান। জ্ঞান স্থান ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। জ্ঞান নির্গুণ তাই নিরপেক্ষ।

সৃষ্টিপ্রসঙ্গ চলছে। এতক্ষণ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আধুনিক মতের সম্যক খণ্ডন করা হয়েছে। এবার জীবসৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করছেন

জীবসৃষ্টি বিষয়ে জড়বিজ্ঞানমতম্ অনুমানং হি ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ : জীবসৃষ্টি বিষয়ে ও জড়বিজ্ঞানের মত অনুমানই।

English Translation : The opinion of the material science in respect of the creation of life is also hypothetical.

লীনিকা : জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত যেমন অনুমান বলে অসম্পূর্ণ, তেমনি জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে যে আধুনিক মত আছে তা ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞান এখনও নিশ্চয় করে বলতে পারে না কিভাবে এবং কেন জীব সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান তথ্যের (data) উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত অনুমানসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কেন পারে না তার হেতু প্রদর্শন করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

ডারউইনস্য বিবর্তনবাদো ভ্রান্তঃ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ : ডারউন-এর বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ ভুল।

English Translation : The Theory of Evolution as envisaged by Prof. Darwin is also inaccurate.

লীনিকা : যে যে প্রতিভাবান ব্যক্তি মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে অধ্যাপক ডারউইন একজন। তিনি জীবজগতের বিবর্তনবাদ প্রচার করে যশস্বী হয়েছেন। ডারউইন মতের খণ্ডণমণ্ডণ ইতঃপূর্বে নানা ভাবে হয়েছে। কিন্তু তথাপি ডারউইনের বিবর্তন বাদ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিবর্তনবাদ সুদীর্ঘ আলোচনা। এর মূলকথা হল : প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে নেহাৎ কোন আকস্মিক কারণে কতকগুলি সজীব মৌলিক পদার্থের সহযোগে সমুদ্রে সর্বপ্রথম জীবনের বুদবুদ ভেসে উঠেছিল। এ প্রাণপদার্থকে বলে প্রোটোপ্লাজম। এককোষি প্রাণ পদার্থকেই বলে এ্যামিবা। সৃষ্টির প্রায় ২৫ কোটি বছর পর এ্যামিবা নিজেকে দুটোতে ভাঙতে আরম্ভ করল। এর থেকে বিবর্তন মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী এ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। উদ্ভিদ দেহের কোষ সেলুলা গঠিত, কিন্তু

প্রাণীদেহের কোষ সেলুলা গঠিত নহে। প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হল এই যে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীর দেহ থেকে। প্রথম প্রাণীর নাম প্রোটোজোয়া। প্রথমে জীববৃদ্ধি অমৈথুনিক ছিল। পরে জীবদেহে একাধিক কোষ সৃষ্টি হল। সৃষ্টি হল ডিম্ব কোষ ও শুক্র কোষ। পরে আরও বিবর্তনের ফলে ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষ পৃথক পৃথক দেহে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়ে যৌন সৃষ্টির সূত্রপাত হল। প্রথম মৎস্যজাতীয় প্রাণী জলে থাকত। অষ্টি. ও লেপিস জাতীয় মৎস্য প্রথম ডাঙ্গায় উঠে, প্রায় ২৭ কোটি বছর আগে। তার থেকে সৃষ্টি হল সরীসৃপ। তার থেকে জন্মালো স্তন্যপায়ী প্রাণী। তারা ডিম না পেড়ে সন্তান প্রসব করে ও পালন করে। তার থেকে ধীরে ধীরে জন্মালো মানুষাকৃতি বানর। এদের ক্রমিক বিবর্তনের পরিণতিই হল মানুষ।

এ থেকে কি প্রাণীসৃষ্টির কোন কথা জানা যায়? যায় না। কেবল প্রাণীদেহের ক্রমবিকাশটাই জানা যায়। বস্তুত সৃষ্টির রহস্য ভেদ এত সহজ নহে। ডারউইন নিজেই বলেছেন "The mystery of life remains as impenetrable as ever." অথচ ডারউইনভক্তরা ডারউইন পড়ে মনে করে সৃষ্টির কথা তারা জেনে ফেলেছে। এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি কি আর হতে পারে। অবশ্য ডারউইনের বিবর্তনবাদে প্রাণীদেহের বিবর্তনের কিছু কিছু সত্য আভাস আছে বটে। কিন্তু প্রাণী কি করে এল, সজীব পদার্থ কোথা থেকে এল, কেন বা এ্যামিবা জন্মালো জীবন নিয়ে এর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই ডারউইনের মত ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্য।

ডারউইনের মতবাদ ভ্রান্ত কেন, তার উত্তরদান প্রসঙ্গে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র যোজনা করছেন

ব্যতিক্রান্তত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ :—ডারউইনের প্রমাণগুলি নিয়মের উপর নয়, ব্যতিক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ভ্রান্ত।

English Translation : The proofs put forward by Darwin in support of his theory are exception only, not general rules.

টীনিকা:—ডারউইন তার মতবাদের সপক্ষে যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করেছেন তা ব্যতিক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়মকে খাট করে ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করা অবিধেয়। ইহা গ্রাহ্য হতে পারে না। কখন কখন তিন পা-যুক্ত গরু জন্মায়, পাঁচ-পা-যুক্ত ও জন্মায়, উনিশ, একুশ, বা চব্বিশ আঙ্গুল-যুক্ত মানুষ চোখে পড়ে, দুই হৃৎপিণ্ড যুক্ত মানুষের খবর ও কাগজাদিতে পড়া যায়। এ সবই ব্যতিক্রম—নিয়ম নয়। যা নিয়ম নয় তাকে অবলম্বন করে কেউ যদি সিদ্ধান্ত করে বসেন গরু তিন বা পাঁচ পাযুক্ত প্রাণী, মানুষ চব্বিশ আঙ্গুলযুক্ত বা দুই হৃৎপিণ্ড বিশিষ্ট তাহলে ভুলই হবে—এর চেয়ে বেশী ভুল হতেই পারে না। বানরের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বৈসাদৃশ্যই বেশী। অল্প সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে বেশী বৈসাদৃশ্যকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ডারউইন যে কতকগুলি সংযোগ (Link) উল্লেখ করেছেন তা সমস্তই ব্যতিক্রম।

আল্লাসৌরাস ডাইনোসৌরাস লোপ পেয়ে গেল আর অ্যামিবা তার পূর্বরূপে আজও টিকে আছে কি করে। ডারউইন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও কত প্রশ্নই না জাগে। কিন্তু ডারউইনে তার কোন উত্তর খোঁজে পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বলেই এরূপ হয়। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এবং উচিত বিবেচনা সূত্রকার একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করেছেন

চলচ্চিত্রবদিতি দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ: দৃষ্টান্ত স্বরূপ চলচ্চিত্রের উল্লেখ করা যায়।

English Translation:--The inaccuracy of Darwin's theory of Evolution may be compared to unreality of a Cinema show.

টীনিকা:—এ দৃষ্টান্তটি কেবলমাত্র "ব্যতিক্রান্তত্বাৎ" সূত্রের স্বপক্ষে দেওয়া হয় নি। সমগ্র ডারউইনের মতের ভ্রান্তি নির্ণয়ার্থ এ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ছায়ার অভিনয় ব্যতীত কিছুই নহে। তাতে বাস্তবিক কোন সত্তা নেই। অথচ আলো-আঁধারের ভ্রান্তিযুক্ত সিনেমা জগৎ সমগ্র

ব্যবহারিক জগৎকে খাট করে প্রধান হয়ে উঠেছে। সিনেমার নায়ক নায়িকাকে নিয়ে মানুষ যত মাতামাতি করে সত্য মানুষকে নিয়ে মানুষ তত মাথা ঘামায় না। আজ বাস্তব জগৎ মিথ্যা হয়ে উঠেছে। "জগৎ মিথ্যা" একথা প্রমাণ করার জন্য আর শঙ্করাচার্যের আসার প্রয়োজন নেই। সকলের কাছেই জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য না সিনেমা সত্য এখন এই বিচার্য। অজ্ঞদের নিকট ভ্রান্ত সিনেমাই সত্য। সিনেমার মানুষের সুখদুঃখে সে সুখদুঃখ অনুভব করে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীর সুখদুঃখ তার হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে সিনেমা মানুষের নিকট সত্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে তা যেমন ভ্রান্ত তেমনি ডারউইনের যে মত সত্য বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাও ভ্রান্ত।

কেন ভ্রান্ত; তার উত্তর প্রদান করার অভিপ্রায়ে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

দেহোন্নত্যাঽঽত্মোন্নতির্ণ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ :—দেহের উন্নতি হলেই আত্মার উন্নতি হয় না।

English Translation :—According to Darwin the soul (say of human being) has improved with the improvement of body. But the case is not so.

লীনিকা: ডারউইন এক প্রকারের দেহাত্মবাদী ছাড়া আর কিছুই নন। ডারউইনের মতে এ্যামিবার ক্রমোন্নতির ফলেই মানুষ। এ্যামিবা থেকে মানব অবধি বিবর্তনের মধ্যে দেহের যত উন্নতি হয়েছে আত্মারও তত উন্নতি হয়েছে। এ্যামিবার দেহ নিকৃষ্ট তাই তার আত্মাও নিকৃষ্ট। পশুদেহ তার চেয়ে উন্নত, তাই পশু-জীবনে আত্মার আরও বিকাশ হয়েছে। মানবদেহ সর্বোৎকৃষ্ট তাই মানবদেহে আত্মার সম্যক বিকাশ হয়েছে। অন্য ভাষায় দেহের বিকাশেই আত্মার বিকাশ ঘটে। উন্নত দেহ উন্নত আত্মার কারণ হলে দেহ যেরূপ আত্মা সেরূপ তা মানতে হয়। তাহলে এক প্রকার দেহীর একই প্রকার প্রকৃতি হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। সব কুকুর এক প্রকৃতির নয়—কোনটা কামড়ায়, কোনটা নিরীহ। সব মানুষও এক প্রকৃতির হয় না। এমন কি মানব দেহযুক্ত কোন কোন প্রাণীর স্বভাব পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়। কাজেই

দেহের বিকাশে আত্মার বিকাশ হয়-- দেহবাদীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিবর্তনবাদের আরও ভ্রান্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করেছেন

ক্রমোন্নতি-পরাহতত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ : ক্রমোন্নতি এক সময় পরাহত হয় এজন্য (ক্রমোন্নতি নিয়ম এরূপ মানা যায় না)।

English Translation : The theory of Evolution implies that there is a gradual development of every thing. But the socalled development is prevented by some unobserved force(s).

লীনিকা : বিকাশবাদ মতে প্রাণী ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এরূপ নিয়ম হলে প্রাণীতে কেবল উন্নতিই পরিলক্ষিত হত। কিন্তু ক্রমিক উন্নতি পরাহত হতে দেখা যায়। ডাইনোসোরাস প্রভৃতি বিরাটকায় প্রাণীরা উন্নতি না করে একেবারে লোপই পেয়ে গেল। মানুষের কথায়ই আসা যাক। গ্রীক ও রোমকেরা উন্নতি করেছিল। তাদের নিকট উত্তরমানবেরা (Northman) ও পূর্বমানবেরা বর্বর ছিল। উত্তর ও পূর্বমানবেরা ক্রমোন্নতি যথেষ্ট করেছে বটে, কিন্তু সে গ্রীক-রোমকেরা আর নেই। তারা আরও উন্নতি না করে তলিয়ে গেল কেন? যদি বলা যায় যে দেহের উন্নতির সঙ্গে সামাজিক উন্নতির কথা টেনে আনা ঠিক নয়। তাহলে আমরা সমাজপ্রসঙ্গ ছেড়েই দিতে পারি। মানুষের দৈহিক উন্নতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে মস্তিষ্কের উন্নতির জন্য মানুষ এত উন্নতি করেছে সে মস্তিষ্কের আকৃতিগত কোন উন্নতি হয় নি। মানুষ মানুষের প্রাচীনতার যে পর্যন্ত সন্ধান পেয়েছে সে সময়ের মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতিগত কোন ভেদ নেই। এত কেন, মানুষের একটা কড়া আঙ্গুলের ও উন্নতি হয়নি। এ জন্য নৃতত্ত্ববিদরা (Enthropologists) ডারউইন মত আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ক্রমোন্নতি নিয়ম হলে ক্রমোন্নতিই হত। কিন্তু তা হয় না। কাজেই বিকাশবাদ অগ্রাহ্য।

এ বিষয়ে আরও নিদর্শন প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করে বলেছেন

সৃষ্টি পর্যায়-অযৌক্তিকত্বাৎ ॥৩৯॥

সূত্রার্থ : আধুনিক দেহবাদীদের সৃষ্টির ক্রমপর্যায়-মত যুক্তিহীন বলিয়া পরিত্যজ্য।

English Translation : The views as shown by the modern materialists regarding the gradual process of creation being unreasonable is unacceptable.

লীনিকা : আধুনিক দেহাত্মবাদীদের মতে সৃষ্টির ক্রমপর্যায় হল এই যে প্রথম জলচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তারপর উভচর; উভচর থেকে স্থলচর। তারপর সৃষ্টি হয় খেচর। অর্থাৎ খেচর হল দেহের সর্বশেষ বিকাশ। যদি দেহের বিকাশে আত্মার বিকাশ নিয়ম হয় তা'হলে খেচর প্রাণীদের মধ্যে আত্মার বিকাশ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় না। স্পষ্টই দেখা যায় ভূচরে এবং ভূচরদের মধ্যে মানুষেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সর্বাধিক। কাজেই দেহের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে এবং দেহের উন্নতিতে আত্মার বিকাশ হচ্ছে এরূপ বলা যুক্তি হীন; অতএব অগ্রাহ্য।

আরও বিশদ ভাবে বিষয়টিকে গোচরীভূত করাবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্রে বলছেন

ইতর প্রাণী ॥৪০॥

সূত্রার্থ : ক্রমোন্নতি নিয়ম হলে মনুষ্যেতর অন্তত আরও কোন প্রাণীকে পশুত্বের উর্ধ্বে দেখা যেতো।

English Translation : Had been the gradual development of body a cause of the Gradual development of soul, at least one more creature other than man could be seen living a life of rationality (a life above aminality).

লীনিকা : বিকাশ বা বিবর্তনবাদের আলোচনা প্রসঙ্গেই এ সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। বিকাশ বাদের মত হল এই যে বিবর্তন বশে প্রাণীরা ধীরে ধীরে উন্নতিপথে অগ্রসর হচ্ছে। এ যদি নিয়ম হয় তাহ'লে প্রত্যেক প্রাণীই উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে একথা বলা যায়। তাহলে মনুষ্যেতর অন্য যে কোন প্রাণীকে আমরা শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতায় উন্নত হতে দেখতে পেতাম। মানুষই ত বিকাশ

বাদের একমাত্র পরিণতি নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীকে পশুত্বের পর্যায় অতিক্রম করতে দেখা যায় নি। অবশ্য পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে সামাজিক জীবন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ সমাজ ত সংস্কার (instinct) বশে গঠিত হয়। এ সমাজ প্রকৃতিগত। তাতে তাদের কোন প্রচেষ্টা নেই। মানুষের যে গুণের জন্য মানুষ মানুষ সে গুণ অথবা তার চেয়েও উৎকৃষ্ট অন্য কোন গুণ অন্য কোন প্রাণীতে দেখা যায় না কেন? আরও দেখা যায় যে, যে প্রাণী যে ভাবে ছিল ঠিক সে ভাবেই রয়ে গেছে। মানুষের জানার যুগে কোন প্রাণীর কোনরূপ উন্নতি ঘটেনি। মানুষের জানার এত কোটি বছর আগে এত এত ঘটনা ঘটেছিল এরূপ অনুমান অগ্রাহ্য।

দেহাত্মবাদী-বিবর্তনবাদ কেন অগ্রাহ্য তার আরও একটি হেতু প্রদর্শনার্থ সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করেছেন

সংযোজক-অমিত-সংখ্যকত্বাৎ ॥৪১॥

সূত্রার্থঃ যে সমস্ত সংযোজক (Data) অবলম্বন করে বিকাশবাদ প্রতিষ্ঠিত সেগুলির সংখ্যা অমিত অর্থাৎ পর্যাপ্ত নয় বলে (অপর্যাপ্ত সংযোজকের উপর প্রতিষ্ঠিত সূত্র অগ্রাহ্য)

English Translation: The data on which the theory of Evolution (as envisaged by Darwin and others) are inadequate and as such conclusion derived from them is not acceptable.

লীনিকাঃ এ সূত্র "ব্যতিক্রান্তত্বাৎ" সূত্রেরই পরিপূরক। জীবসৃষ্টি বিষয়ক আধুনিক দেহাত্মবাদী গবেষণা-কার্য কতকগুলি সংযোজক বা Link অর্থাৎ Dataর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সংযোজক-এর উপর এ মত প্রতিষ্ঠিত তার সংখ্যা যথেষ্ট নহে। তাই এগুলি নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। নিয়মকে খাট করে ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিকাশবাদে বলা হয়েছে যে প্রথম জলচর প্রাণীর পর উভচর প্রাণী জন্মে। ব্যাঙ, সরীসৃপ ইহার উদাহরণ। সরীসৃপ থেকে স্থলচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়, পশু, মানব প্রভৃতির। তারপর সৃষ্টি হল আকাশচারী পক্ষীর। হংসচঞ্চু (Duck Bill) তার একটা সংযোজক। কিন্তু হংসচঞ্চু মাত্র একটা উদাহরণ। এর উপর নির্ভর করে বলা যায় না যে চতুষ্পদ থেকেই পক্ষীর জন্ম হয়েছে। খেচর কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট পতঙ্গ আছে

তাদের পূর্ব-সংযোজক (Link) কোন স্থলচর প্রাণী? জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কত অসংখ্য রোগ বীজাণু এবং অন্য বীজাণু আছে। কে বলল এ বীজাণুগুলো বিবর্তনের ফল?

টিকা: বস্তুত গবেষণা করে মানুষ যা নির্ণয় করে তা কতকগুলি সামান্য মিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামান্য মিল থাকাটাই একত্বের নিদর্শন নহে। আসামের ভাষা ও উড়িষ্যার ভাষায় কিঞ্চিৎ মিল আছে। তাতে কি প্রমাণিত হয় আসামী ও উড়িয়াদের উৎপত্তি স্থল এক? আসামে মেয়েরা মেখলা ও ওড়না পরে। অন্ধ্র দেশেও মেয়েরা মেখলা ও ওড়না পরে। তাতে কি প্রমাণ হয় আসামী ও অন্ধ্রীয়দের উৎপত্তি এক? পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক গবেষণা করার সময়ে প্রাচীন দ্রব্যাদি দেখে কাল নির্ণয় করেন। তাদের মতে একই ধরণের দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে সে সব দ্রব্যাদি এক কালেই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আজ সমগ্র পৃথিবীতে একত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবু সব দেশ সব জিনিষ আবিষ্কার বা আয়ত্ত করতে পারে নি। এটম রকেট প্রভৃতি সব দেশ একসঙ্গে আয়ত্বে আনতে পারে নি।

দেহাত্মবাদীদের বিবর্তন সূত্রের আরও ভ্রান্তি প্রদর্শনার্থ সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করে বলছেন

বানরাৎ ভ্রান্তিঃ ॥৪২॥

সূত্রার্থ: বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে দেহাত্মবাদী-বিবর্তন বাদের এ মত ভুল।

English Translation :—The deduction of the materiatistic doctrine that human being originated in apemen or monkey is fallacious.

দীনিকা: বিকাশবাদ বলে যে বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এমনকি যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাও হয়েছে যে দুই প্রাণীর সংমিশ্রণে এক তৃতীয় প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়। যেমন গর্দভ ও ঘোটকের সংমিশ্রণে হয়েছে খচ্চড়, তেমনি ব্যাঘ্র ও সিংহের মিশ্রণে হয়েছে বাংহ বা সিংঘ্র। এর বলেই তারা দাবী করে যে মানুষও এরূপ সৃষ্টি হয়েছে। তা যদি হয় তবে বানর এবং বানরের মিলনে ত তৃতীয় মানব হতে পারে না। মানুষের পূর্ব পুরুষের একটি বানর হলে অপরটি কি? আসল ব্যাপার হল ঘোটক গর্দভ-এরা একই পর্যায়ের প্রাণী বলে সন্তান উৎপন্ন করতে পারে। মানুষের মধ্যে ও ককেসীয় ও নিগ্রো, বা নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রেলীয় মিলে সন্তান উৎপন্ন করতে পারে।

সিংহ-ব্যাঘ্র প্রাকৃতিক পরিবেশে সন্তান উৎপন্ন করতে ব্রতী হয় না। মানুষ তাদের ধরে পিঁজরায় পুরে সন্তান উৎপাদনে যে বাধ্য করেছে ইহা নিতান্ত অপ্রাকৃতিক কার্য এবং এজন্য ব্যতিক্রম। তবু সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয়ে থাকলেও এটা বিবর্তনের প্রমাণ নহে। তারা একই পর্যায় ভুক্ত প্রাণী। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন অপ্রাকৃতিক প্রচেষ্টা বানর এবং বানরেতর প্রাণীকে মানুষ সন্তান উৎপন্ন করতে নিয়োজিত করেছিল? বিবর্তনের নিয়মই প্রমাণ করে যে বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এ ধারণা ভুল। বিবর্তন বলে পূর্বে ঘোড়া ছিল আঙ্গুলবিশিষ্ট, হাতি ছিল কদাকার। বিবর্তনের ফলে আঙ্গুলবিশিষ্ট ঘোড়া লুপ্ত হয়ে হল খুরাবশিষ্ট, কদাকার হাতি লুপ্ত হয়ে হল বর্তমান হাতি। কিন্তু ঘোড়া ঘোড়া এবং হাতি হাতিই রয়ে গেল। বিবর্তনের নিয়মই হল এক অবস্থা বিলুপ্তির পর আর এক অবস্থা প্রাপ্তি। কেবল বানরের ক্রমিক বিকাশ মানুষ হলে বানরের রূপের লোপ হয়ে যেত। বস্তুত বিবর্তন এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় উপনীত করে, কিন্তু এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে নিয়ে যেতে পারে না। বিবর্তন আজও মানুষের হচ্ছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন বার্দ্ধক্যে মানুষ বিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে এক মানুষ আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছে না। একই মানুষ থেকে যাচ্ছে। কাজেই বানরই বিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছে এ ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ।

তবে মানুষ কি ভাবে হল? তার উত্তরে সূত্রকার বলছেন

মানবাঃ সৃষ্ট্যৌ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ ঃ বস্তুত সৃষ্টি থেকেই মানুষ মানুষ।

English Translation: Man is human being from the very origin.

লীনিকা ঃ পূর্ব সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই এসূত্র রচিত হয়েছে। এ সূত্রের তাৎপর্য এই যে মানুষ মানুষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, পশু থেকে নয়। পশু থেকে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না। হয়ত একথা সত্যি হতে পারে যে পূর্বের মানুষের রূপ বর্তমান মানুষের তুলনায় কুৎসিত ছিল, হয়ত দেখতে বর্তমানের

মানুষের মত সুন্দর ছিল না। কিন্তু পূর্বের মানুষেরা ও মানুষই ছিল। তারা কখনও পশু ছিল না।

টিকা : মানুষ এক কোষী জীব থেকেই জন্মায়। আজও জন্মাচ্ছে। কিন্তু যে এককোষী জীব থেকে মানুষ জন্মে তা মানুষেরই গুণযুক্ত। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা হবে।

তর্কে তর্ক প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ : তর্কে তর্কই প্রতিষ্ঠিত হয়।

English Translation : Argument establishes only itself.

লীনিকা : এটা একটা নিরপেক্ষ সূত্র। সূত্রের তাৎপর্য এই যে তর্কে তর্কেরই প্রতিষ্ঠা হয়, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তর্কের প্রয়োজন আছে। একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তর্কই সব নয়। কাজেই সত্যসন্ধানীকে সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টা করাই উচিত। কেন ? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

জ্ঞানাদ্ উপজায়তে ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ : জ্ঞান থেকেই সবকিছু উৎপন্ন হয়।

English Translation : Everything emerges out of the Supreme Consciousness.

লীনিকা : সৃষ্টি স্বভাবতই হয়েছে। এ জগৎ চরাচর কেউ সৃষ্টি করেনি। সবই স্বয়ম্ভূত। জ্ঞান থেকেই সব উৎপন্ন হয়।

টিকা : জ্ঞান থেকে কিভাবে জগৎ ও জীব সৃষ্টি হয়েছে তা পরে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

স্থিতঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ : সব কিছু জ্ঞানেই স্থিত থাকে।

English Translation : Everything rests on the Supreme Consciousness.

লীনিকা : এ সূত্র পূর্ব সূত্রেরই ধারক। জগৎচরাচর সবকিছু যেমন জ্ঞান

থেকে উৎপন্ন হয় তেমনি জ্ঞানেই স্থিত থাকে। জ্ঞানেই যে সবকিছু স্থিত আছে এ বৃহৎ সত্য সকলের প্রত্যক্ষ ধারনায় আসা সম্ভব হয়ত নয়। তবে সকলেই একটি সাধারণ সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকে। নিদ্রাবস্থায় যখন সাময়িক ভাবে প্রাণী' জ্ঞান আবৃ হয়ে পড়ে তখন তার নিকট ' জগৎ থাকে না। নিদ্রাভঙ্গে যখন পুনরায় জ্ঞান উন্মোচিত হয় তখন আবার জগৎ প্রাণী-চিত্তে ভেসে উঠে। এবং সে অবস্থায় জগৎ স্থিত থাকে। এ যেমন সত্য তেমান ণ সমস্ত জগৎ যে জ্ঞানে স্থিত আছে ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ। জ্ঞানেই সবাকছুর পরিসমাপ্তি হয়

English Translation Everything ends in the Supreme Consciousness

লীনিকা। জ্ঞান থেকে যেমন সৃষ্টি হয়, জ্ঞানে যেমন সব কিছু স্থিত থাকে তেমনি জ্ঞানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তিও ঘটে। জ্ঞান লাভ হলেই জাগতিক সব লয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের সত্তা যে স্বাধীন, বস্তু অপেক্ষিত নহে একথাটা বলবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

নাস্তি জ্ঞানাতিরিক্তং কিঞ্চিদপি—জগদতিরিক্তং
কেবলং জ্ঞানম ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থঃ জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই নেই। জগতের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞানই আছে।

English Translation There is nothing outside the supreme Consciousness What exists above all the worldliness is the Supreme Conscicuseness

লীনিকাঃ প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানই আছে। জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। অনেকে বলতে পারেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এখনও কত শতসহস্র বস্তু রয়েছে যা আমরা এখনও জানি না। জানি না যা তা

আমাদের জানার অভাব মাত্র। জানি না, অথচ আছে বলে যে মানি এটাই জ্ঞানের সর্বব্যাপ্তির প্রমাণ। যা আমরা জানি না তাও জ্ঞানে আছে। আছে যে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। জানার বাইরেও জ্ঞান আছে। এ জ্ঞান বস্তুনিরপেক্ষ, জগতের অতিরিক্ত এবং জানার অতীত জ্ঞান কখনও জানা যায় না। জ্ঞানকে লাভ করতে হয়। জ্ঞান কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ: জ্ঞানকে ব্রহ্ম এ সংজ্ঞাখ্যা দেওয়া হয়।

English Translation The Supreme Consciousness is defined as Brahma.

লীনিকা: জ্ঞান কি নয় একথা নানাভাবে নানাভাষায় ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু জ্ঞান যে কি তা কোন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। জ্ঞান কেন কোন কিছুরই যথার্থ স্বরূপ ভাষায় কখনও ব্যক্ত করা যায় না—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবু অপর মানুষকে কিছু বুঝাতে গেলে তাকে ভাষায় কিছু বলতে হয়। ভাষায় জ্ঞান না হলেও ভাষায় মানুষ বুঝে। কাজেই জ্ঞান কি তা বুঝাবার জন্য ঋষিরা জ্ঞানের 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা দিয়েছেন। জ্ঞানই ব্রহ্ম। অথবা অন্যভাবে বলতে পারি ব্রহ্ম বলে আমরা যা শুনে আসছি তার স্বরূপই হল জ্ঞান। জ্ঞান লাভ হলে কি হয়—তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

ভ্রান্তির্জ্ঞানাদ্ বিলীয়তে ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ: জ্ঞান থেকে ভ্রান্তি দূর হয়।

English Translation ; This absolute Consciousness removes all doubts.

লীনিকা: আলো প্রজ্জ্বলিত হলেই যেমন আঁধার থাকে না তেমনি জ্ঞানলাভ হলেই আর ভ্রান্তি থাকে না, কোনরূপ সন্দেহ ও থাকে না। অতএব, সূত্রকার বলছেন

জ্ঞানমুপগচ্ছেৎ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ : সর্বাগ্রে জ্ঞান লাভ করা উচিত

English Translation :—The truth-seeker, therefore, ought to attain Jnanam or the supreme consciousness first.

লীনিকা : তর্ক বিচারের উপসংহার করে সূত্রকার এ সূত্র রচনা করেছেন। তর্কের কোন শেষ হয় না। এক তর্ক থেকে আর এক তর্ক আসতে পারে। এতে মীমাংসার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মধু মিষ্ট না তিক্ত এ বিষয়ে তর্ক করে কোন ফল নেই। তার চেয়ে একটু মধু খেয়ে নিলেই সব তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়। তেমনি সত্য কি, জ্ঞান কি ইত্যাদি নিয়ে তর্ক করেও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে জ্ঞান লাভ করাই শ্রেয়। একমাত্র জ্ঞান লাভ হলেই জিজ্ঞাসার শেষ হবে। অতএব সত্যসন্ধানীর সর্বাগ্রে জ্ঞান লাভ করাই উচিত। কিভাবে জ্ঞান লাভ করা যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ : তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়।

English Translation :—The Supreme consciousnesss is to be attained in accordance with the directions of those who know the Divine Truth.

লীনিকা : তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের নিকট থেকেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। অন্য কারো নিকট থেকে বা কেবল নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই জ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চললে তবে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। অন্যথায় হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পাঠ করলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না। অপরপক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পাঠ না করেও যদিও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলা যায় তা'হলেও স্বাস্থ্যবান হওয়া সম্ভব হয়। তেমনি শাস্ত্র কেবল পাঠ করলেই জ্ঞান হয়ে যায় না, অপরপক্ষে শাস্ত্র পাঠ না করেও যদি শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা যায় তবেই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। শাস্ত্র জানা সহজ, কিন্তু তার নির্দেশ মেনে চলা

কঠিন। জ্ঞান লাভ করতে গেলে শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম মেনেই চলতে হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ বহু। তন্মধ্যে প্রধানটি উল্লেখ করে সূত্রকার বলেছেন

সংযমেন ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ: জ্ঞানলাভ সংযমের দ্বারা সম্ভব।

English Translation :—Restraint is the first needful to attain the Truth.

লীনিকা: জ্ঞানলাভের জন্য সংযমের যে একান্ত প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেন যেকোন জ্ঞানলাভের জন্যই সংযমের দরকার। কেন না—

অসংযমাচ্চিত্তচাঞ্চল্যম্ ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ: অসংযম থেকে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠে।

English Translation: —Absence of restraint makes the mind unsteady.

লীনিকা: অসংযমীর চিত্ত চঞ্চল থাকে। চঞ্চলচিত্তের তত্ত্বদর্শন হয় না। অতএব জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক যারা তাদের সংযম অবলম্বন করা উচিত।

টিকা—জ্ঞানলাভের বিজ্ঞান (অধ্যাত্মবিজ্ঞান) সম্মত উপায় সম্বন্ধে পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উপক্রমণিকা হিসাবে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করা গেল।

সমাপ্তোঽয়মধ্যায়ো প্রথম:

ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবর্তীবিরচিতলীনিকায়াং প্রথমোঽধ্যায়:।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

অধ্যাত্ম জ্ঞানের ও অধ্যাত্ম জীবনের বিরুদ্ধে যত প্রকার সম্ভাব্য প্রাচীন ও নব্য মতের বিরোধ উপস্থিত হতে পারে প্রথম অধ্যায়ে তার সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বস্তুবাদ ও বস্তুবিজ্ঞান যতই প্রবল ও উন্নত হোক না কেন শান্তিকামী প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন এখনও পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে। বস্তুলাভ করাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের কথা ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করা যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাদের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান অবশ্যই করণীয়। বস্তুত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মানুষের কোন তৃষারই নিবৃত্তি হয় না। এ কথা সব সময় সকলে মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। তবে অনেকেই শেষ পর্যন্ত মানে, কিন্তু সময় হারিয়ে। কাজেই সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যের উচিত সময় থাকতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। এখন কথা হল তত্ত্ব কি? এতদপ্রসঙ্গে সূত্রকার বলেছেন

আত্মা তত্ত্বম্ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ : আত্মাই তত্ত্ব

English Translation The Self is the Truth.

দীপিকা: জগতে যত প্রাণী আছে, তাদের প্রত্যেকেই আত্মসুখের চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। যে যা করছে তার মূলে আত্মসুখ। এমন কি যারা অত্যন্ত বস্তুবাদী তারাও আত্মসুখের জন্য সদা সচেষ্ট। প্রাণী আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হোক বা না হোক, আত্মা কি তা জানুক বা না জানুক, আত্মসুখ তার কাম্য। আত্মসুখ ছাড়া অন্য সুখ নাই। আত্মার বর্তমানেই সব কিছু, আত্মার অবর্তমানে কিছুই নাই। অতএব আত্মাই সব কিছু। আত্মা ছাড়া যখন কোন কিছুই নাই তখন আত্মাই তত্ত্ব, অন্য তত্ত্ব নাই। যে আত্মার জন্য এত, হায় প্রাণীরা তারই সন্ধান করে না। অনেক মনুষ্য মনে করে আত্মার সন্ধান করাই দোষের, আত্মার সন্ধান করা প্রাচীনতার লক্ষণ, এতে বিজ্ঞানের প্রগতি ব্যাহত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা জানে না যে আত্মা স্বয়ং বিজ্ঞানময়,

আত্মা চিরন্তন, আত্মায় প্রাচীন নবীন নাই। এমন কি আধুনিক অত্যাধুনিক যা কিছু সব আত্মার জন্যেই সম্ভব। আত্মার অবর্তমানে কোন আধুনিকতা টিকে না। এমন যে আত্মা, একমাত্র মূঢ়রাই তার সন্ধান করা দোষের বলে মনে করে। আত্মার সন্ধান যাঁরা করে না তাঁরা অজ্ঞান, মৃত্যু তাদের অবধারিত আত্মার সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের মৃত্যু নাই। তারা অমর। মৃত্যুভীত দেহাত্মবাদী আধুনিকদের একমাত্র তাঁরাই শুনাতে পারেন—হে অমৃতের পুত্ররা, শোনো,[১] মৃত্যু নাই। অরে, ধন সম্পদ দিয়ে অমরত্ব লাভ করা যায় না। আত্মার জন্যই প্রিয়জন প্রিয় হয়, আত্মার সন্ধান কর, তবেই অমর হতে পারবে।[২] আত্মা বিহীন অবস্থায় যখন কিছুই থাকে না অতএব বুঝতে হবে আত্মাই তত্ত্ব। আত্মা কি? এখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার বলেছেন

আত্মা দেহী, নতু দেহ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ:—আত্মা দেহী, দেহ নহে।

English Translation The Self is the embodied soul, not the corporal body

লীনিকা: সূত্রে বলা হয়েছে, দেহীই আত্মা, দেহ নয়। এরূপ বলার তাৎপর্য হল আত্মা সম্বন্ধে ধারণার সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করা। আত্মা সম্বন্ধে সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে বটে, কিন্তু এ ধারণা সকলের অভ্রান্ত নয়। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

প্রত্যেকেই তার স্ব বা আত্মাকে আমি' বলে। আর আমি বলতে শরীরকেই বুঝে। কেউ যখন বলে, 'আমি শুনি না" বা "শুনি", তখন সে কানেই আমিত্ব আরোপ করে, কেউ যখন বলে, "আমি দেখি না", বা "দেখি" তখন সে তার দেহ যন্ত্র শ্রোত্রতেই আমিত্ব আরোপ করে, যখন কেউ বলে, "আমি বসি, আমি চলি" প্রভৃতি তখন সে দেহেতেই আমিত্ব আরোপ করে। এক কথায় দেহাত্মবাদীরা দেহকেই আমি বা আত্মা বলে জানে। এখন, হয় দেহই আত্মা, নতুবা আত্মা দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু হবে।

১। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ দ্রষ্টব্য।

বিচার করলে দেখা যায় দেহ আত্মা নয়। কারণ প্রত্যেকেই আমরা দেহটাকে "আমার" বলেও জানি। যা 'আমার' তা 'আমি" হতে পারে না। অতএব দেহ আমি বা আত্মা নয়। দেহ যে আত্মা নয় পরবর্তীকালে সূত্রকারই তা প্রতিপন্ন করবেন। তৎপূর্বে দেহ আত্মা না হলে ও দেহকেই আত্মা বলে লোক কেন মনে করে এ সংশয় দূর করবার জন্য সূত্রকার বলছেন

অজ্ঞানাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ: অজ্ঞানতার জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মা বুঝা যায় না বলেই মানুষ দেহকেই আত্মা বলে মনে করে।

English Translation · Due to ignorance people cannot realise the existence of the Real Self and therefore they consider the body to be the self.

টীকা: জীব দেহ নিয়ে জন্মায়, দেহেই বেঁচে থাকে। দেহের সাহায্যে সুখ দুঃখ অনুভব করে। দেহের সংস্কার এত প্রবল যে জীব দেহভিন্ন আত্মার কল্পনাই করতে পারে না যারা দাঁত বাঁধায়, কিছুদিন ব্যবহার করার পর দাঁত যে false এ ধারণা মানুষের থাকে না। চশমাও ধীরে ধীরে চোখের অংশ বলে মনে হয়। শরীর থেকে অত্যন্ত পৃথক হলেও যেমন অভ্যাস বশে এগুলি পৃথক বলে মনে হয় না তেমনি আত্মা থেকে দেহ অত্যন্ত পৃথক হলেও দেহকে পৃথক বলে মনে হয় না। পোষাক দেহের সঙ্গে যুক্ত নয়, পৃথক। তবু যদি কোন কারণে কারো সখের পোষাক একটু খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যায় বা দাগ লেগে নষ্ট হয়ে যায়, দেহ তাতে আহত না হলেও মানুষ দুঃখ অনুভব করে। এ যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি জানতে হবে যে দেহের দুঃখে (বা সুখে) আত্মার দুঃখ (বা সুখ) না হলেও দেহের দুঃখ (বা সুখ) কেই লোকে আত্মার দুঃখ (বা সুখ) বলে মনে করে। এ সবই ভুল। সমস্তই অজ্ঞানতা প্রসূত। দেহই আত্মা হলে আত্মা সর্বদা দেহগুণ-বিশিষ্ট হত। কিন্তু তা কখনও হয় না। দেহের সঙ্গে আত্মার কোনই সম্বন্ধ দেখা যায় না। কি ভাবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলেছেন

ন বৃহদ্দেহাদাত্মবৃহত্ত্বম্ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ: দেহ বৃহৎ হলেই আত্মা বৃহৎ হয় না।

English Translation : Bigness of the body never means bigness of the soul.

টীনিকা : দেহই আমি বা আত্মা হলে যার দেহ যত বৃহৎ তার আমিত্ব তত বৃহৎ হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। একটি হাতির আমিত্বে ও পিপীলিকার আমিত্বে কোন তফাৎ নেই। ইতর প্রাণীর কথা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কথায় আসা যাক। গান্ধীর চেয়ে গামার দেহ ছিল বৃহৎ ও মজবুত। তাহলে গান্ধীর চেয়ে গামার আমিত্ব বৃহত্তর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। গান্ধী ক্ষুদ্র আত্মার লোক নন। বরং গামার চেয়ে গান্ধী ছিলেন অধিকতর আত্মসচেতন। কাজেই বৃহৎ দেহ যদি বৃহৎ আমি না হয় তাহলে দেহ ও আমি বা আত্মা হতে পারে না।

এ বিষয়ে সূত্রকার দৃষ্টান্তান্তর প্রদর্শন করে বলেছেন

ন দেহাংশ-হীনত্বাৎ আত্মাংশ-হীনত্বম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ : দেহের অংশবিশেষ হীন হয়ে গেলেও আত্মার কোন অংশ হীন হয়ে যায় না।

English Transnlation : Maimedness of body never means deficiency of the soul.

টীনিকা : দেহ যদি আত্মা হয় তা হলে দেহাংশ হীন হলে আত্মার অংশও হীন বলে মনে হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। চুল দাড়ি গোপ সবই দেহের অংশ। এসব কেটে ফেলে দেওয়াই বর্তমানের ফ্যাশন। তাতে ত আত্মার অংশহীনতা অনুভূত হয় না। চুল দাড়ির কথা না হয় বাদই দিলাম। এমন ও ত হয় যখন কারো কারো হাত পা গভীরভাবে কেটে যায়। তাতে আত্মা কেটে গেল এরূপ ত মনে হয় না। শুধু তাই বা কেন, কারো কারো দেহাংশ কেটে কখন কখন বাদ দিতে হয়। বিনোবা ভাবের একটি ফুসফুস নেই, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের একখানা পা ছিল না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বা বিনোবা ভাবের কি আত্মবল কম ছিল, না বহুর চেয়ে বেশী? দেহাংশ হীন হলেও যদি আত্মা হীনাংশ না হয়ে পড়ে তা'লে দেহ ও আত্মা হতে পারে না। দেহ আত্মা নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটি আপত্তি হতে পারে এই যে হীনাঙ্গরা কি নিজেদের পূর্ণাঙ্গদের চেয়ে হীন বলে

মনে করে না—একটি inferiority feeling কি তাদের মধ্যে নেই? তার উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে সূত্রকার বলছেন

মনোবিকারাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ: মনের বিকারের জন্য হীনাঙ্গরা নিজেদের হেয় বলে মনে করে।

English Translation : The deficient consider themselves to be inferior to the full bodied because of deviation of the mind from its natural state.

দীপিকা : এ কথা সত্য যে হীনাঙ্গদের মধ্যে একটা হেয়-ভাব (inferiority feeling) থাকে। পূর্ণাঙ্গদের দেখলে তাদের মনে ঈর্ষার ভাবও জাগতে পারে। কিন্তু এ যে হেয়-ভাব তা আত্মার নয়, মনের। এরূপ ভাব পূর্ণাঙ্গদের মনেও জাগতে পারে। কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিবিশেষ যদি কুদর্শন হয় তাহলে সুদর্শন ব্যক্তিবিশেষের কাছে সে নিজেকে হেয় ভাববে, সুদর্শন ব্যক্তিকে সে ঈর্ষা করবে। হেয় ভাব বা ঈর্ষা যদি পূর্ণাঙ্গতেও থাকে তাহলে বুঝতে হবে এ ভাব আত্মার নয়। অপরের সৌভাগ্যে মন যখন বিকারগ্রস্থ হয় তখনই তাতে হেয় ভাব জাগে। হীনাঙ্গ ব্যক্তিও যখন একাকী নিজের কথা ভাবে তখন সে তাকে পূর্ণ বলেই মনে করে। পূর্ণাঙ্গদের মতই সে তার নিজের বা আত্মার সুখের জন্য যত্নবান হয়। তাতে কোনরূপ হীনত্ব থাকে না। অতএব বুঝতে হবে মনের বিকারের জন্যই হেয়ভাব জাগে। অঙ্গহীনতা আত্মার হীনাংশতা বুঝায় না।

অনন্তর দেহ যে আত্মা নয়, দেহ থেকে আত্মা অত্যন্ত পৃথক তা প্রদর্শন করার জন্য সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করেছেন

আত্মধর্মো দেহধর্মাদন্যঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ: আত্মার ধর্ম দেহধর্মের চেয়ে পৃথক।

English Translation : The characteristic feature of the Self is essentially different from that of the body.

লীনিকা : দেহ আত্মা হলে দেহের ধর্মই আত্মার ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু বিবেচনা করলে দেখা যায় দেহধর্মের সঙ্গে আত্মধর্মের কোন সাদৃশ্য নাই। বরং উভয়েই অত্যন্ত পৃথক। প্রথমাবস্থায় এরূপ মনে হতে পারে যে দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বিকাশ হয়। শৈশবে দেহ অপুষ্ট থাকে, তখন ভালমন্দ জ্ঞানই থাকে না। ধীরে ধীরে বাল্য অতিক্রম করে জীব যৌবনের দিকে অগ্রসর হয়। যৌবনে দেহ পরিণত হলে জ্ঞানেরও বিকাশ হয়। অতএব দেহের সঙ্গে আত্মার পৃথকতা নাই এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা ঠিক নয়। একথা ঠিক বাল্যে ভালমন্দ জ্ঞানই থাকে না। কিন্তু আত্মার কাছে যে ভালমন্দ কিছু নেই। ভালমন্দ ত সম্পূর্ণ জাগতিক ব্যাপার। বাল্যে আত্মার জ্ঞান যথার্থই থাকে। ধীরে ধীরে প্রাক্তন সংস্কার বলে ঐহিকের সংস্কার সে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরবর্তীকালে সংস্কারযুক্ত জ্ঞানই (যাকে পূর্বেই অজ্ঞানতার পর্যায়ে ফেলা হয়েছে) জ্ঞান বলে প্রতিভাত হতে আরম্ভ করে। শৈশবেও জ্ঞান থাকে। সে জ্ঞান পরে বিস্মৃতিতে ঢাকাপড়ে যায়। জাতিস্মর হয়ে যারা জন্মায় দেখা যায় তাদের পূর্বজন্মের জ্ঞানও সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে ; ধীরে ধীরে তা বিস্মৃতিতে ঢাকা পড়ে যায়। কাজেই বাল্যে জ্ঞান থাকে না, যৌবনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলে জ্ঞান হয় এরূপ বলা ভুল। পরে যে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় তা জাগতিক জ্ঞানের, আত্মজ্ঞানের নহে। আমাদের মূল বক্তব্য হল এই যে দেহই আত্মা হলে দেহধর্মই আত্মার ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু তা কখনও হয় না। কি করে হয়না তা প্রদর্শন করতে গিয়ে সূত্রকার বলছেন

দেহঃ সান্তঃ বাসনানন্তা ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ : দেহ সসীম কিন্তু বাসনা অসীম।

English Translation : The body is limited while the desire is unlimited.

লীনিকা : আমাদের দেহ সীমাবদ্ধ—সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত মাত্র। অথচ আমাদের বাসনা অনন্ত। সীমাবদ্ধ দেহে অসীম বাসনার স্থান হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে দেহের কোন বাসনাই নাই, বাসনা "আমার"ই। আমার অস্তিত্ব অসীম বলেই বাসনা অসীম। অতএব আমার অস্তিত্ব বা আমি দেহ-

নিরপেক্ষ। আমি দেহ নহে। দেহ থেকে পৃথক অবস্থা যার বর্তমান জ্ঞানে নাই, সেই দেহকে আত্মা বলে মনে করে মাত্র। দেহ কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত হতে পারে কিন্তু আত্মায় কৃষ্ণ-শ্বেত-পীত ভেদ নাই। আত্মার সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধই নাই। আত্মা দেহে বাস করে তাই দেহী। দেহে আত্মার সংযোগেই দেহের আমিত্বজ্ঞান। এ সংযোগ বশতঃই দেহের বাসনা। অনন্ত আত্মার সংযোগ জন্যই "আমার' বাসনা অনন্ত। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দেহের কোন বাসনা থাকে না। অতএব বুঝতে হবে দেহ আত্মা থেকে অত্যন্ত পৃথক।

দেহের ধর্ম ও আত্মার ধর্মের পৃথকত্ব আরও বিশদ করার উদ্দেশ্যে সূত্রকার বলছেন

বার্ধক্যে অনভিপ্সা ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থঃ কেহই বার্ধক্য ইচ্ছা করে না।

English Translation : None is desirous of getting old.

টীকাঃ এ সূত্র দেহধর্মের সঙ্গে আত্মধর্মের পৃথকত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছে। দেহই আমি বা আত্মা হলে দেহের ধর্মই আমার ধর্ম হওয়া উচিত, দেহধর্মের অন্যথা করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। দেহের ধর্ম কি? দেহ জন্মে, বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পেতে পেতে বৃদ্ধ হওয়া ও দেহের ধর্ম। অথচ আমি বৃদ্ধ হতে চাই না। চুল সাদা হয়ে যাক, টাক পড়ুক, দাঁত নড়ুক, চামড়া কুচকে যাক্, চোখ কম দেখুক এ সব কেউ চায় না। দেহ আমি হলে আমার চাওয়া দেহের বিপরীত হয় কি প্রকারে? যেহেতু আমার দেহের সঙ্গে আমার চাওয়া বিপরীত অতএব বুঝতে হবে আমি ও দেহ ও বিপরীত অর্থাৎ আমি বা আত্মা দেহ নহে। এ বিষয়ে আরও স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্রস্থাপন করেছেন

মরণে চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থঃ মরণেও কারো ইচ্ছা নেই।

English Translation No body wants to die too.

টীকাঃ এ সূত্র পূর্ব সূত্রেই পরিপূরক বলে গণনা করা যেতে পারে।

অথবা স্বতন্ত্র বলে গণনাও করা যেতে পারে। দেহের ধর্ম এই যে দেহ যেমন জন্মায় তেমনি বর্ধিত হয় আবার বৃদ্ধ, বিকল হয়ে একদিন মরেও যায়। মৃত্যু দেহরই ধর্ম। অথচ কেউই মরতে চায় না। সকলেই বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকাই আত্মার ধর্ম। অতএব দেখা যায় দেহধর্মের সঙ্গে আত্মার ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই দেহ আত্মা হতে পারে না।

দেহ যে আত্মা নয়, দেহাত্মবাদীব্যক্তিদের এ সত্য আরও স্পষ্ট করে বুঝাবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

মৃত দেহেঽনহম্ভাব সত্ত্বাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থঃ মৃত দেহে কোনরূপ আমিত্ব বা আত্ম ভাব নাই।

English Translation : A dead body is without any self-feeling.

লীনিকাঃ দেহই আত্মা হলে মৃতদেহেও আত্মভাব বা আমিত্ব বোধ থাকত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় মৃতদেহে কোনরূপ আমিত্বের লক্ষণ নেই। দেহ ত পড়েই থাকে তবে 'আমি' থাকে না কেন? অতএব বুঝতে হবে আমি জিনিষটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমি দেহ ছাড়া হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুব পর যে আমিটা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় ঋষিরা জীবন্ত অবস্থায়ই সে আমিটাকে দেহ থেকে পৃথক ভাবে উপলব্ধি করেন। আমিটাকে পৃথক ভাবে জানতে পেরেই তারা পৃথক 'আমি'র কথা বলেছেন। দেহ যে আমি নয় এ বোধ একবার জন্মালেই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে দেহে আমিত্ব জ্ঞান ভ্রান্তিজনক। ভ্রান্ত আমিত্ব জ্ঞানে আমরা জগতের যা কিছু দেখছি তা ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নহে। কাজেই জাগতিক ভ্রান্তি অপসারণ করার জন্যই আমিত্বের ভ্রান্তি অপসারণ করা অতীব প্রয়োজন। আমিত্বকে বা আত্মাকে একবার দর্শন করলেই আর ভ্রান্তি থাকে না। এজন্য সত্য উপলব্ধির জন্য আত্মদর্শনের প্রয়োজন। এজন্যই আত্মাকেই তত্ত্ব বলে বলা হয়েছে। অন্য তত্ত্ব নাই। আত্মাকে জানলেই সব ভ্রান্তি, সব সংশয় দূর হয়ে যায়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে দেহ আত্মা নয় এটুকু জানলেই ত জানা হয়ে গেল যে আত্মা দেহাতিরিক্ত। কিন্তু তা নয়। আত্মা কি নয়, এ কথা জানলেই আত্মা কি তা জানা হয় না। এজন্যই সূত্রকার সবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন

আত্মা জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ: আত্মাই জ্ঞেয়।

English Translation : The Self is the true Knowable

দীনিকা : প্রকৃত পক্ষে আত্মাই জ্ঞেয়। আত্মাকে না জানতে পাবলে সকল জানাই ভ্রান্ত হয়ে যায়। অতএব বুঝতে হবে রকেট, এটম স্পুটনিক, লুনিক প্রভৃতি জানাগেলেও তা জ্ঞেয় নয়। কারণ এসব জানাতে জ্ঞানেব তৃষ্ণা মিটে না। অপর পক্ষে একবার আত্মজ্ঞান লাভ করলে আর কোন তৃষ্ণাই থাকে না। এজন্যই সূত্রকার বারবার বলছেন, হে মানুষ আত্মাই জ্ঞেয়, একবার আত্মদর্শন কর। তাহলেই বুঝতে পারবে আত্মা অমব। আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় মরছ যারা তারা আত্মজ্ঞান লাভ করে অমর হও।

অবশ্য তর্কের শেষ নাই। তার্কিকবা তর্ক উত্থাপন কবে বলতে পারেন যে দেহ আত্মা নয় তা বুঝা গেল। আত্মা দেহাতিরিক্ত কিছুই হবে। মনই দেহাতিরিক্ত অতএব মনই আত্মা। সান্ত দেহে অনন্ত বাসনার উদ্ভব হয় মনের জন্যই। জ্ঞানতৃষ্ণা ও মনেরই। অতএব মনই আত্মা। তার্কিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার উদ্দেশ্যে সূত্রকাব পরবর্তী সূত্র স্থাপনা কবছেন

ন মন আত্মা ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ :—মন আত্মা নহে

English Translation :—The mind is also not the soul

দীনিকা : দেহ আত্মা নয়, বুদ্ধি আত্মা নয়, মনও আত্মা নয়, এসব কথা শাস্ত্রাদিতে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তবু এ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। একথা ঠিক যে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান মনেরই, জাগতিক সুখ দুঃখের বোধ ও মনেই হয়। তবুও মন বলতে যা বুঝায় তা আত্মা নয়। মন থেকে আত্মা স্বতন্ত্র। মন জাগতিক জ্ঞানের জ্ঞাতা বটে কিন্তু জ্ঞেয় নয়। মনকে জানতে গেলে আব মন থাকে না। একথা জানার জন্য কোন যোগ সাধনের প্রয়োজন নাই। যে মন বিশ্বচরাচর ছুটে বেড়াচ্ছে, একবার "মন কি?" এ ভাবনা এলেই মনের কোন অস্তিত্ব

থাকে না। অপর পক্ষে আত্মা জ্ঞেয়। আত্মার জ্ঞান লাভ করা সহজ নয় কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান লাভ করলেই বুঝা যায় যে একমাত্র আত্মাই আছে। এভাবে বিচার করলে আমরা মনের সঙ্গে আত্মার পৃথকতা দেখতে পাই। এ সত্যকে আরও বিশদ ভাবে বুঝাবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলছেন

মনোঽভাবান্নাত্মাঽভাবঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ: মনের অভাব হলে আত্মার অভাব হয় না।

English Translation :—The Negation of mind is not the negation of the self.

লীনিকা: মনই যদি আত্মা হত তাহলে মনের অভাবেই আত্মার অভাব হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয় না। সময় সময় মনের অভাব হয়ে থাকে কিন্তু তাতে আত্মার অভাব হয় না। মনের সন্ধান করলেই দেখা যায় মন থাকে না। অবশ্য মনের সন্ধান করে মনকে না পাওয়ার সত্য উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য অন্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ সত্যকে বিশদ করার উদ্দেশ্যে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র উপস্থিত করছেন

সুষুপ্তিরিতি দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ: দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুষুপ্তির উল্লেখ করা যেতে পারে।

English Translation : A state of sound sleep may be cited for example.

লীনিকা: সময় সময় মনের অভাব যে সম্ভব সুষুপ্তিই তার প্রমাণ। যাদের শারীরিক বিকার নেই, নিদ্রা যাদের গাঢ় তারা প্রত্যেকেই এ সত্যটুকু নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারেন যে সুষুপ্তির সময় মন বলে কিছু থাকে না। তখন মন থাকলে মনের কাজও থাকত। মন থাকে না বলেই জগৎ তখন অগোচর হয়ে পড়ে। কিন্তু মন না থাকলে আত্মা থাকে না এমন হয় না সুষুপ্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি নয়। সুষুপ্ত ব্যক্তিতে মন থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকে। কাজেই মনের অভাব হলে যখন আত্মার অভাব হয় না তখন মন যে আত্মা নয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সুষুপ্তিতে মন থাকে না, তাই

সুখ দুঃখও থাকে না। কিন্তু আত্মা থাকে, তাই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে, নিদ্রাভঙ্গে আবার জীব জেগে উঠে।

অনেকে আবার তর্ক উত্থাপন করে বলতে পারেন যে সুষুপ্তিতে মনের অভাব হয় না। মন থাকে না এর প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পারে যে নিদ্রা যায় মনই, নিদ্রাভঙ্গে যে জেগে উঠে সেও মন। অতএব মনই জীব বা আত্মা। এ তর্কের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে সূত্রকার বলছেন

সমাধিশ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ: সমাধিতে মন থাকে না, (তখন একমাত্র আত্মস্বরূপ জ্ঞানই বর্তমান থাকে।)

English Translation —In a state of samadhi meaning deep meditation the mind dissolves but the eternal self, the Divine wisdom, remains.

দীপিকা: নিদ্রিত অবস্থায় জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। কাজেই এমতাবস্থায় সুষুপ্তিতে মন থাকে, না থাকে না, তা' জ্ঞানের জ্ঞান নাও হতে পারে। এজন্যই মনই আত্মা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু সমাধি-অবস্থায় জ্ঞান স্ব স্বরূপে অবস্থান করে বলে জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে না। তখন মন বলেও কিছু থাকে না। মন থাকে না, অথচ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা থাকে বলেই ঋষিরা মন যে আত্মা থেকে পৃথক এ সত্য উপলব্ধি করছেন। অবশ্য সমাধি লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সমাধির কৌশল অবগত নহে তাদের পক্ষে এ সত্য প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উপলব্ধি করা কষ্টকর হতে পারে। কাজেই তাদের পক্ষে ঋষি বাক্যের উপর আস্থা রাখাই বিধেয়। সমাধি যোগে ঋষিরা আত্মায় আত্মা ব্যতীত আর কিছুই পান না, তখন এক শান্ত অবস্থা থাকে মাত্র। সমাধি ভঙ্গ হলেই শান্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন আত্মা থেকেই মন জন্মায়। এজন্য সূত্রকার বলছেন

মন আত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ: মন আত্মা থেকেই জন্মায়

English Translation : The mind emerges out of the soul.

লীনিকা : জ্ঞানের স্বরূপচ্যুতি ঘটলেই জ্ঞান আর শান্ত-জ্ঞানে থাকে না। জ্ঞানে এক চঞ্চল অবস্থার সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের চঞ্চল অবস্থার নামই মন। অতএব মন আত্মা থেকেই জন্মায়। কি করে জন্মায় তা পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। জ্ঞানের চঞ্চল অবস্থায় সকলই জীব। জীবাবস্থায় সাধারণের স্বরূপ-জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। জীবাবস্থায় মহাপুরুষরা পর্যন্তও বিচলিত হন, যন্ত্রণা অনুভব করেন। শুনা যায় রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত ভাগীনেয় হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আজকাল বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত আহার সংগ্রহের কাজে প্রতিযোগিতা করতে হয়, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মনের জ্ঞানে থাকলেই মানসিক সুখ দুঃখ, উত্তেজনা গ্লানি প্রভৃতি ভোগ করতেই হবে। আত্মার সুখ দুঃখ কোন কিছুই নাই। মনের দুটোই আছে। মন নিয়ে বাস করতে গেলে এ দুটো থেকে কারো অব্যাহতি নাই।

তবে কেন মনে আত্মার আরোপ করা যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

ভ্রান্তি বশাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ : ভ্রান্তি বশেই মনে আত্মারোপ করা হয়।

English Translation :—The mind is considered to be identical with the soul through delusion.

লীনিকা : মনে আত্মারোপ ভ্রান্তি বশেই হয়। যতদিন আত্মার স্বরূপ এবং মনের স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন ভ্রান্তি থাকে। একবার আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হলে মনকে আর আত্মা বলে মনে হয় না। যত ভ্রান্তি আমিত্ব মূলে। আমি কে তা ঠিক না করেই আমি সব বিচার করছি। এ জন্যই সব বিচার বেঠিক ঠেকে। ঠিকের নির্ণয় করতে হলে এ ভ্রান্তিকে দূর করতে হবে। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভ্রান্তির নিরসন হয়। এজন্যই আত্মদর্শন প্রণয়নের চেষ্টা।

সমাপ্তোঽয়মধ্যায়ঃ দ্বিতীয়ঃ।

ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবর্তীবিরচিত-লীনিকায়াং
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

বস্তুবিজ্ঞানেব ও দেহাত্মবাদেব সঙ্গে আধ্যাত্মিকজ্ঞানেব একটা বিশেষ পার্থক্য হল এই যে দেহাত্মবাদ মতে দেহই আত্মা অথবা দেহ থেকেই আত্মার উদ্ভব হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে দেহ আত্মা নয়, আত্মা থেকেই দেহেব উদ্ভব হয়। কোনটা ঠিক? পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দুটোব উল্লেখ করেছি। আমবা দেখিয়েছি যে আত্মা কখনও দেহের কায হতে পাবে না। কেননা কাবণ বিদ্যমান থাকলে কার্যেবও অবশ্যই বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু মৃত দেহে আত্মাব কোন কায নাই। কাজেই দেহ আত্মার কারণ হতে পারে না। অর্থাৎ দেহ থেকে আত্মা জন্মাতে পারে না। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহ যে আত্মা নয় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবা হয়েছে। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন, যদি আত্মা দেহ বা দেহজাত না হয় তাহলে আত্মা কি এ প্রশ্ন আসে। আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, এরূপ উত্তরও যথার্থ হয় না। কাজেই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় কবা বিশেষ প্রয়োজন। এ অভিপ্রায়ে সূত্রকার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন

আত্মা ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ: আত্মা ব্রহ্মই।

English Translation : The selt is the Eternal Soul

লীনিকা: বস্তুর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কবা যায় না। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আত্মার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কবা সম্পূর্ণই অসম্ভব। কাজেই আত্মাব স্বরূপ কি এব উত্তব এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে আত্মা ব্রহ্মই। বস্তুত আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি ও নামই। নাম ব্যতীত নামীকে অন্যের নিকট ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলেই নাম বলতে হয়। আত্মা কি একথা বলতে গিয়ে এ জন্যই বলতে হয় যে আত্মা ব্রহ্মই। এক নামকে অপব নাম দিয়ে প্রকাশ কবার তাৎপর্য এই যে নামের অর্থে যেন ভ্রান্তি না

আসে। সাধারণত লোকে দেহেই আত্মার আরোপ করে থাকে। তা' ভুল। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান থাক বা না থাক, তবু ব্রহ্ম বলতে মানুষের একটি ধারণা আছে যে ব্রহ্ম সাধারণ দেহ নয়, ব্রহ্ম একটা বিরাট কিছু। আত্মা যে স্বরূপতঃ সেই বিরাট কিছু একথাটা বলবার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মকে দিয়েই আত্মার পরিচয় দেবার প্রয়াস করা হয়েছে।

নামীর নাম-পরিচয় আরও যাহা আছে তার উল্লেখ করে সূত্রকার বলছেন

পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বা প্রণববাচকম্ ইতি ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ :—আত্মাই পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম নামে অভিহিত, যাকে প্রণব-বাচকও বলা হয়ে থাকে।

English Translation : This self or soul is also called the Absolute Soul or the Absolute Spirit which signifies the mystic syllable Om.

লীনিকা : আত্মাকে যেমন ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা যায়, তেমনি পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সব একই নামীর নাম। সেই নামীর বাচক শব্দ প্রণব। বস্তুত প্রণবের যা স্বরূপ তাই সেই নামী। একমাত্র প্রণবের স্বরূপ অবস্থায়ই নাম ও নামীর অভেদ অনুভূত হয়। ইহাই চরম অবস্থা। জ্ঞানীরা সে অবস্থার সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করে আত্মার স্বরূপ যেরূপ অবগত হয়েছেন তদুল্লেখ ক্রমে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করে বলছেন

কারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ : আত্মাই সৃষ্টির কারণ।

English Translation : The Soul is the cause of creation.

লীনিকা : এ জগৎ ও জীব সৃষ্টির মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ বিদ্যমান আছে। কোন কিছু না থাকলে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই মানতে হবে এ সৃষ্টির আদিতে কোন না কোন কারণ ছিল যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে

এই জগৎ-চরাচর। কি ছিল আদিতে? আধুনিক বিজ্ঞান বলে একটি নীহারিকা ছিল আদিতে, কিংবা একটি বিরাট সূর্য। সৌরজগৎ সৃষ্টির মূলে একথা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির কথায় এলে এ মত টিকে না। একথা প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে। কারণ এ অসংখ্য নক্ষত্রসমাকীর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ একটি বিরাট সূর্য নয়। অর্থাৎ নীহারিকা বা সূর্য সৃষ্টির আদি কারণ নয়। তবে আদি কারণ কি? আত্মাই সৃষ্টির আদি কারণ। আত্মা থেকেই এ জগৎ চরাচর সৃষ্টি হয়েছে। দেহ থেকে আত্মার সৃষ্টি হয়নি। আত্মা থেকেই যে সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ কি? সূত্রকার প্রথমেই বলেছেন প্রত্যক্ষই প্রমাণ। আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষে অনুভব করলেই জানা যাবে যে আত্মাই সৃষ্টির কারণ। আত্মাতিরিক্ত অন্য কারণ নাই। আত্মার সম্যগ্‌জ্ঞান যাদের জ্ঞানে নাই তাদের আমিত্বেই ভুল। তারা এ সত্য অস্বীকার করার অধিকারীই নয়। আত্মার সম্যগ্‌জ্ঞান যাদের জ্ঞানে বিদ্যমান তাদের কাছে তা প্রত্যক্ষ সত্য। সৃষ্টির কারণ যে আত্মা তা' প্রত্যক্ষ সত্য।

আত্মা থেকে কি ভাবে সৃষ্টি সৃষ্ট হল এ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেছেন

আত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ : আত্মার স্বরূপ জ্ঞান।

English Translation ; The Soul in reality is the knowledge in itself.

টীনিকা: আত্মার স্বরূপ কি তা ব্যক্ত করতে গিয়ে সূত্রকার বলছেন যে জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানের অজ্ঞানাবৃতাবস্থায় আত্মার জ্ঞানও থাকে না, আবার জ্ঞানের স্বজ্ঞানাবস্থায় একমাত্র আত্মার জ্ঞানই থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞানীদের আত্মার কোন জ্ঞান থাকে না। আবার সমাধি অবস্থায় জ্ঞানীদের একমাত্র আত্মজ্ঞানই থাকে। যেহেতু জ্ঞানের অবর্তমানে আত্মার অবর্তমানতা এবং জ্ঞানের বর্তমানে আত্মারও বর্তমানতা পরিলক্ষিত হয় তখন জ্ঞানই যে আত্মা এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ জ্ঞান বা আত্মা থেকেই সৃষ্টি। উপায়-বিশেষ অবলম্বনে আত্মার স্বরূপে উপনীত হলে একমাত্র জ্ঞানই থাকে অন্য কিছু থাকে না। তা থেকেই বুঝা

যায় আদিতে জ্ঞানই ছিল, বর্তমানে জ্ঞানই আছে, ভবিষ্যতে জ্ঞানই থাকবে। আবার তদবস্থার অবসানে জগৎ-জ্ঞানে ফিরে আসার পর এ জগৎ পুনরায় অনুভূত হতে থাকে; তাতে বুঝা যায় জ্ঞান থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়। নিদ্রাবস্থায় জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। তখন জগৎ থাকে না। নিদ্রাভঙ্গ হলে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ জ্ঞানে ভেসে উঠে। এর থেকে ও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে জ্ঞান বা আত্মা থেকেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

কি ভাবে জ্ঞান থেকেই এ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বিবেচনা করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

জ্ঞানামীতি জ্ঞানস্য ধর্মঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থঃ জ্ঞানের ধর্ম জানা

English Translation: The virtue of knowledge is to know.

লীনিকা। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এক সূক্ষ্ম অবস্থা। সে অবস্থা থেকে এ স্থূল জগৎ কি করে সৃষ্টি হতে পারে—এ এক রহস্যময় জিজ্ঞাসা সকলেরই আছে। যা জানা যায় না তাই রহস্য। কিন্তু একবার জানা হয়ে গেলে তা আর রহস্য থাকে না। বস্তুত সৃষ্টি বলে আমরা যা জানি তা সূক্ষ্ম আত্মারই সৃষ্টি। শক্তি থেকেই যে পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে তা পদার্থবিজ্ঞান সম্মত। আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে শক্তি ও শক্তির আধার একই। শক্তি থেকেই পদার্থ সৃষ্টি হয় এ যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য তেমনি আত্মা থেকেই যে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাও আধ্যাত্মিক সত্য। এ সত্য ব্যখ্যার জন্যই সূত্রকার জ্ঞানের ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন আলোর ধর্ম যেমন প্রকাশ, তেমনি জ্ঞানের ধর্ম ও জানা। তাই, সূত্রকার বলছেন

জ্ঞানায় প্রচেষ্টা ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থঃ জানতে হলেই জানার জন্য চেষ্টা

English Translation: To know is to endeavour to know.

লীনিকা: যেহেতু জ্ঞানের ধর্ম জানা, তখন জানবার জন্য প্রচেষ্টাও জাগে।

কেন না প্রচেষ্টা ব্যতীত জানার উপায় নেই। তাই জানবার জন্য জ্ঞান প্রচেষ্টা করে। প্রচেষ্টার ফল কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

স্পন্দনম্ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ: চেষ্টার ফল স্পন্দন।

English Translation : Fndeavour to know gives rise to a vibration in the knowledge itself.

লীনিকা: এ জানার প্রচেষ্টায় জ্ঞানে জাগে স্পন্দন। যেকোন রূপ চেষ্টা করলেই স্পন্দন জাগে। কাজেই জ্ঞানের জানার প্রচেষ্টায়ও স্পন্দন জাগে। এ স্পন্দন জ্ঞানেরই। সৃষ্টির মূলে এই স্পন্দন। স্পন্দন থেকে কি সৃষ্টি হয়? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

হ্কারঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ: স্পন্দন মূলে হ্কার সৃষ্টি হয়।

English Translation : As a result of the Vibration a force called "Hah" is created.

লীনিকা: জ্ঞানে জানার প্রচেষ্টামূলক স্পন্দন জাগার ফলে জ্ঞানের মধ্যে সৃষ্টি হয় 'হ্'কার। 'হ্'কার হল শক্তি। এ শক্তি ধ্বনিমূলক। এ ধ্বনিমূলক শক্তিই হল জ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি। পরবর্তী সৃষ্টির কারণ। বিষয়টিকে আর একটু বিশদ করাব দরকার।

পূর্বেই বলা হয়েছে আত্মা, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, জ্ঞান প্রভৃতি একই কথা। ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে প্রণব। প্রণব কি? ওঁকার। ওঁকারের স্ব-ভাব অবস্থা শান্ত। এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করাব কোনই উপায় নেই। মানুষের দুইটি চিন্তার মধ্যবর্তী ফাঁক (gap between two thoughts) যে রূপ শান্ত ঠিক তেমনি। এ অবস্থাকে প্রকাশ করাব কোনই উপায় নেই বলে বলা হয়েছে ওঁকার অস্বর ও অব্যঞ্জনবর্ণ অর্থাৎ ওঁকার স্বরবর্ণও নয় ব্যঞ্জনবর্ণও নয়, অতএব তাকে কোন বর্ণ দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের এ শান্ত অবস্থায় জানার জন্য জ্ঞানের মধ্যেই স্পন্দন মূলে 'হ্'কার রূপ শক্তির সৃষ্টি

হয়। এ শক্তি প্রণবেই উৎপন্ন হয়ে প্রণবচ্যুত হওয়ার মত মনে হয়। ফলে একাক্ষর প্রণব ত্রিধা হয়ে শব্দিত হয়। অর্থাৎ শান্ত একাক্ষর ওঁকার তখন ম্+উ+অ হয়ে যায়; হ্ ম্ থেকে উৎপন্ন হয়ে উ এবং অ হয়ে 'হ্'তে বেরিয়ে পড়ে। ইহা প্রণবের দ্বিতীয় অবস্থা। প্রথম অবস্থা শান্ত, হকার-বর্জিত। দ্বিতীয় অবস্থা ধ্বনিত, হ্কার যুক্ত। প্রথম অবস্থা নির্গুণ, দ্বিতীয় অবস্থা সগুণ। হ্-মুক্ত সৃষ্টি নাই, হ্যুক্ত অবস্থায়ই সৃষ্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে হ্ই সৃষ্টি।

এখন, এই শান্ত প্রণব থেকে হ্কারের যে সৃষ্টি তাই বা কি প্রকার? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

হকারো ভ্রান্তিঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ: হ্কারের সৃষ্টি ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়।

English Translation: The Emergence of Hah-force out of the quiet state of Brahma. the supreme soul is the delusion.

লীনিকা: জ্ঞান এক এবং অদ্বিতীয়। দ্বিত্ব যখন নাই তখন আবার জানা-জানি কি? কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে জানাই জ্ঞানের ধর্ম। জ্ঞান জানবেই অথচ জানার কিছুই নাই। জ্ঞানে জ্ঞান ব্যতীত যখন আর কিছুই জানার নাই তখন জানবার প্রচেষ্টা ভ্রান্তি বই কি? প্রচেষ্টা ভ্রান্তি, ভ্রান্তি-প্রচেষ্টা রূপ স্পন্দন্ ও ভ্রান্তি, স্পন্দন রূপ হ্কার ও তাই ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি জ্ঞানেই জন্মে এবং জ্ঞানেই থাকে।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে জ্ঞানের ভ্রান্তি হওয়া কি ভাবে সম্ভব! সত্যে কি কখন মিথ্যা থাকতে পারে? যদি না পারে, তাহলে জ্ঞানেই বা ভ্রান্তির অবস্থান কি ভাবে সম্ভব? জ্ঞানের ভ্রান্তি কি সম্ভব হতে পারে? ভ্রান্তির কারণ কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

ভ্রান্তি-র্হি ভ্রান্তিকারণম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ: ভ্রান্তিই ভ্রান্তির কারণ, অন্য কারণ নাই।

English Translation : The cause of delusion is nothing else than the delusion itself.

লীনিকা : ভ্রান্তির কারণ কি থাকতে পারে ? ভ্রান্তিই ভ্রান্তির কারণ, অন্য কারণ নাই। জ্ঞানে জানার কিছু নেই অথচ জানার জন্য প্রচেষ্টা ভ্রান্তি বই কি ? যা ভ্রান্তি তার কোন স্বরূপ নাই। ভ্রান্তি আছে মনে করা ও এক ভ্রান্তি, অথচ তাকে অস্বীকারও করা যায় না। এইখানেই হল রহস্য। শঙ্করাচার্য উপায়ান্তর না দেখে এ রহস্যকে বলেছেন অনির্বচনীয়। স্বরূপতঃ যা নাই রূপতঃ তারই অস্তিত্বের হেতু বর্ণনার কোন উপায় নেই। ভ্রান্তি যে ভ্রান্তি,—সত্য নয়, একথা ঠিক, অথচ ভ্রান্তিও যে হয়—একথা ও ঠিক। ভ্রান্তি কি ? জ্যামিতির ভাষায় বলতে পারি বিন্দু। বিন্দুর কোন ব্যাপ্তি নাই, অথচ বিন্দু আছে, শুধু আছে নয়, বিন্দুই রেখা সৃষ্টি করে, রেখা তল সৃষ্টি করে, তল বস্তু সৃষ্টি করে। অন্য ভাষায় বলতে পারি ভ্রান্তি কল্পনা। কল্পনা অলীক অথচ কল্পনা আছে। শুধু আছেই নয়, কল্পনা কত কিছু ভাঙছে গড়ছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানে ভ্রান্তি নাই, ভ্রান্তিবশেই ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ওঁকারে হ্‌কার নাই, ভ্রান্তিবশে হ্‌কার আছে বলে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ চরাচরের অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষায় জগৎ-চরাচর আছে বলে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞানে দেহানুভূতি নেই ক্রিয়ামূলেই দেহানুভূতি জাগে। ক্রিয়া বন্ধ হলে দেহ থাকে না, কিন্তু আত্মজ্ঞান থাকে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিলুপ্তিতে জগৎ চরাচর থাকে না কিন্তু ব্রহ্ম থাকে, হ্‌কারের বিলোপ হলে স্পন্দন থাকে না, শান্ত ওঁকার থাকে, ভ্রান্তির অপসারণ হলে আর ভ্রান্তি থাকে না তখন একমাত্র জ্ঞানই থাকে। জ্ঞানই আছে ভ্রান্তি নাই, তবু ভ্রান্তি বশে কেন ভ্রান্তি হয়, ওঁকারে হ্‌কার না থাকলেও কি করে আছে বলে মনে হয় তা অনির্বচনীয় হলেও বুঝবার সুবিধার জন্য একটি দৃষ্টান্তের সহায়তা অবলম্বন করা যেতে পারে বিবেচনায় সূত্রকার বলেছেন

নিদ্রেতি দৃষ্টান্তঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ : দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিদ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে।

English Translation : Slumber may be cited for instance.

লীনিকা : একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। দৃষ্টান্ত প্রমাণ না হলেও বুঝার পক্ষে সহায়ক বলেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। দেখা যায় যে ব্যক্তি এখন জেগে আছে সে পরে নিদ্রা যায়। নিদ্রা কি বাইরের জিনিষ, বাইরে থেকে ব্যক্তির মধ্যে আসে? না তা নয়। নিদ্রা বাইরে থেকে আসে না। তবে কি নিদ্রা আভ্যন্তরীণ বস্তু, জাগ্রত ব্যক্তি-মানুষের মধ্যেই থাকে? তাই যদি হবে তবে জাগ্রত ব্যক্তি জাগ্রত থাকে কি করে? যার মধ্যে নিদ্রা আছে সে জাগ্রত থাকতে পারে না। প্রত্যেক জাগ্রত ব্যক্তিই নিদ্রা যায়, অথচ নিদ্রাকে বাইরেরও বলা যায় না, ভিতরের ও বলা যায় না। এ যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি ভ্রান্তিকে জ্ঞানের মধ্যে আছে এরূপ বলা যায় না, আবার জ্ঞানের বাইরে আছে এরূপও বলা যায় না। নিদ্রা জাগ্রতকে অভিভূত করে তাও ঠিক আবার নিদ্রা ভঙ্গ হলে নিদ্রার কোন অস্তিত্ব থাকেনা তা'ও ঠিক! তেমনি ভ্রান্তি জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আবার ভ্রান্তিভঙ্গে কোন ভ্রান্তিই থাকে না তা'ও ঠিক। জাগ্রত ব্যক্তিতে নিদ্রা না থাকলেও নিদ্রার আবির্ভাব যেমন হয় তেমনি ওঁকারে হ্‌কার না থাকলেও হকারের আবির্ভাব ঘটে। নিদ্রার স্বরূপ না থাকলেও যেমন নিদ্রার অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় তেমনি হ্‌কারের কোন স্বরূপ না থাকলেও হ্‌কার আছে বলে মনে হয়। ভ্রান্তি অলীক হলেও যে আছে বলে ভ্রান্তি হচ্ছে এটাই প্রকৃত রহস্য। রহস্য ভেদ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। এ রহস্য বহু শাস্ত্রে বহু ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সে সবের উল্লেখ অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলছেন

প্রকৃতি-মায়া-শক্তি প্রভৃতি অভিধা ॥১২॥

সূত্রার্থ : হ্‌কারকেই প্রকৃতি, মায়া, শক্তি প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করা হয়।

English Translation : This Hah-force is also known by many other names, namely Prakriti, Maya, Sakti etc.

লীনিকা : আমরা যে হ্‌কারকে ভ্রান্তি বলে বললাম, সাঙ্খ্যে তাকেই প্রকৃতি, বেদান্তে তাকেই মায়া, তন্ত্রে তাকেই শক্তি, বৌদ্ধতন্ত্রে তাকেই অজ্ঞান বলে

বলা হয়েছে। নামে বিভিন্ন হলেও আসলে একই। জ্ঞানের জানার ইচ্ছাব কথা আমরা যা বলেছি, বেদ* সেই জানার ইচ্ছাকেই কাম বা বাসনা বলে বলেন। এরই নাম মন বা প্রজাপতি বা ব্রহ্মা। এর নামই কল্পনা। কল্পনা থেকেই সৃষ্টি। কল্পনা থেকে সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে তা বলতে গিয়ে সূত্রকাব বলেছেন

হ্‌কারাৎ ধ্বনিঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ : হ্‌কার থেকেই ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

English Translation : The Hah force produces sounds in the quite state Om, diffusing it into M-U-A.

লীনিকা : জানার প্রচেষ্টায় শান্ত জ্ঞানে স্পন্দন জাগার জন্য যে শক্তি হয় তাই হ্‌কার। হ্‌কার এর জন্য শান্ত প্রণব ধ্বনিত হয়ে উঠে। অর্থাৎ ওঁকার তখন ম্‌-উ-অ (অবতরণ অবস্থায়, অবরোহন অবস্থায় অ-উ-ম্‌) হয়ে ধ্বনিত হতে থাকে—হ্‌ তখন বাইরে বিক্ষিপ্ত হযে যেতে চায়। কিন্তু হ্‌ অনন্ত ব্রহ্মের বাইরে যেতে পারে না। তাই ধ্বনিত অবস্থায় প্রণবে হ্‌ ও অবস্থান করে। এরূপে আমরা পাই চারটি ধ্বনি—ম্‌-উ-অ এবং হ্‌। ব্রহ্মের এ অবস্থাব নাম শব্দব্রহ্ম। একাক্ষর ওঁকার থেকে সৃষ্টি হয় চার ধ্বনি, বা বর্ণ। এ চার ধ্বনি বা বর্ণ দিয়েই শব্দব্রহ্মেব সূত্র বা formula তৈবী কবা হয়েছে—হ্‌-অ-উ-ম্‌। তন্মধ্যে হ্‌ হল ব্যঞ্জন, বাকী স্বর।

যে সূত্র সাহায্যে শব্দব্রহ্মের প্রকাশ করা হয় তার আরও নাম আছে। তাব উল্লেখ কবে সূত্রকার বলছেন

আকাশ-বিরাড্‌-ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদি আখ্যা ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ : তাই আকাশ, বিরাট, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

English Translation : This Shabda-Brahma is also called Akasha, Birat, Brahmanda ete.

লীনিকা : ধ্বনির নামই আকাশ। আকাশ সর্বব্যাপী। আকাশের শেষ

* টিকা : ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১—১৬ দ্রষ্টব্য।

নাই—অসীম, কেন না ব্রহ্ম ও অসীম। আকাশকে অতিক্রম করে যাওয়া যায় না; যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই আকাশ। মানুষ যে মনে করছে আকাশকে জয় করছে তা ভুল। আকাশকে আবার জয় করবে কি। গ্রহ নক্ষত্রে ছুটাছুটি করলেও মানুষ আকাশ অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন জিনিষই স্থানচ্যুত হয় না। স্থানের বস্তু স্থানেই থাকে। বাহ্যতঃ মনে হয় বটে মানুষ রকেট চড়ে বহু স্থান অতিক্রম করে এসেছে কিন্তু এরূপ মনে হওয়া ভ্রান্তি। স্থান অতিক্রম করা যায় না। বস্তুর অপেক্ষায় স্থান অতিক্রান্ত হয় বলে মনে হয়। একটা উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় :ব্যক্তি জন্মায়, বড় হয়, বুড়ো হয়, মরে যায়। নানা পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তন মোটেই হয় না। দেহের অপেক্ষায় মনে হয় যে ব্যক্তিবিশেষ এই জন্মালো, এই বড় হল, এই মরল। কিন্তু আসলে সে ব্যক্তি তেমনিই থাকে। শিশু দেবদত্ত আর বৃদ্ধ দেবদত্ত একই ব্যক্তি।

যাই হোক, এ শব্দময় আকাশকেই বেদাদি শাস্ত্রে বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ড রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে অর্থাৎ ওঁকার থেকেই বিরাট অর্থাৎ ম্+উ+অ—হ্ জন্মেছে। তা সর্বব্যাপ্য, তাই বিরাট। তা ব্রহ্ম থেকে জাত তাই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড অসীম অনন্ত, তবে অনাদি নয়, ব্রহ্মই তার আদি। এ বিশ্বচরাচর ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থিত আছে

কিন্তু এ বিশ্বচরাচর এল কোথা থেকে ? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

তস্মাৎ সৃষ্টিঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ :—বিরাট থেকেই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হয়েছে।

English translation : Out of this Virat emerges every thing, moving or steady, of this Universe.

লৌনিকা: এই বিরাট বা ম্-উ-অ—হ্ থেকেই সৃষ্টি। তন্মধ্যে ম্-উ-অ হল পুরুষ বা চেতন, এবং হ্ হল প্রকৃতি বা জড়। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ অ-হ সংযোগেই জীব। জিনিষটা এরূপ—

পুরুষ { ম, উ, অ }
অ, হ } জীব
প্রকৃতি হ

জ্ঞান যখন অউম্-তে থাকে তখন শুধুই জ্ঞান থাকে, জ্ঞেয় জ্ঞাতা থাকে না। জ্ঞান যখন অ-হ মধ্যে থাকে তখনই জীব। তখন জ্ঞানের চেতন অবস্থাও কিছু থাকে আবার ভ্রান্তি (হ্ কার)ও থাকে। জ্ঞানের এ অবস্থা ভ্রান্ত-জ্ঞান। যখন জ্ঞান হ কারে নেমে পড়ে তখন হকার বা ভ্রান্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় কোন চেতনা থাকে না। জড় পদার্থ এ জন্যই অচেতন। কিন্তু শক্তির আধার। পদার্থের একটা অণুতে মহাশক্তি লুক্কায়িত। কিন্তু শক্তি চেতন নয় বলেই জড় পদার্থ জড়।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব ও জড় যা কিছু দেখি সবই ধ্বনি থেকে জাত। ধ্বনি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম এক এবং নিরপেক্ষ। ব্রহ্ম অদ্বৈত। কিন্তু সৃষ্টি বা জগৎ ত্র্যশ্র (ত্রি + অশ্র),—চৈতন্য, জড় (বা প্রকৃতি) এবং জীব, এ নিয়েই জগৎ-চরাচর।

সমাপ্তোয়মধ্যায় তৃতীয়ঃ ॥

ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবর্তী-বিরচিত-টীনিকাযাং তৃতীযোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

পূববর্তী অধ্যায়ে সৃষ্টির হেতু বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টির আদি। জ্ঞানের জানার প্রচেষ্টায় যে স্পন্দন জাগে তাতে সৃষ্টি হয গতি। গতি বশে শান্ত জ্ঞান ধ্বনিত হয়ে উঠে। গতিযুক্ত ধ্বনিই হল বিরাট। তাতেই আছে পুরুষ, জীব এবং প্রকৃতি—বা চেতন, জীব ও জড়। একই বিরাটে তিনের স্থিতি। তিনকে একও বলা যায়। তিনও বলা যায়। বেদে এ কথাটাকেই "একোঽহং বহুস্যাম" বলা হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির এ ব্যাখ্যা সূক্ষ্ম সৃষ্টি সম্বন্ধীয়। সৃষ্টির সূক্ষ্ম তাৎপর্য তাই। কিন্তু সৃষ্টি বর্তমানে আর সূক্ষ্ম অবস্থায় নেই। চেতন পূর্ববৎ একই আছে কিন্তু জীব এখন অসংখ্য, জড় পদার্থ বহু। এক আমিত্ব এখন বহুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একই জীব, একই জড় বহুত্ব কি করে প্রাপ্ত হল, বিশেষ করে মনুষ্য-পদবাচ্য জীবের সৃষ্টি কি করে হল তা দেখা দরকার। প্রথম অধ্যায়ে জগৎসৃষ্টি ও মনুষ্যসৃষ্টি সম্বন্ধীয় আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের অযথার্থ মতগুলোর খণ্ডন করা হয়েছে, এবার যথার্থ সত্য মতের মণ্ডন করা দরকার। এ সব বিবেচনা করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

স্থূল-সৃষ্টিঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ: এবার স্থূল সৃষ্টি ব্যাখ্যাত হবে।

English Translation : Now the creation of the visible world is to be explained.

লীনিকা: এতক্ষণ সৃষ্টির সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্ম সৃষ্টি বতমানে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সৃষ্টি সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে স্থূল অবস্থায় কি ভাবে এল তা বিচার করা দরকার—নতুবা মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ হবে না। বিশেষ করে, তথাকথিত আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের মতগুলি খণ্ডন করার পর সত্য ও যথার্থ মত প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। নতুবা

আধ্যাত্মিক বিচাব সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু প্রথমতঃ স্থূলসৃষ্টি বলতে কি বুঝায় তা সুস্পষ্ট কবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার বলছেন

জীবস্য জগতশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ: স্থূল সৃষ্টি বলতে জীব ও জগৎ সৃষ্টিব কথা বুঝায়।

English Translation : This means the creation of both the animal kingdom and the Universe consisting of the moon, the earth, the sun—all the planets and the stars

টীনিকা: স্থূল সৃষ্টি বলতে জীব ও জগৎ সৃষ্টিব কথাই বলা হয়েছে। চেতন যা তা পূর্ববৎ আছে। কিন্তু জীব ও জডজগৎ বর্তমানে আব সূক্ষ্ম অবস্থায় নেই—স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। চতুবর্ণেব যে সূত্র পূর্বে দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে হ্ ই ছিল প্রকৃতি। হ্ থেকে আবও বহু বর্ণেব সৃষ্টি আছে। প্রকৃতিতে নানারূপ জড পদার্থ দেখা যায়। হ্ ই যে প্রকৃতি তা এখন বুঝাই যায় না। তাছাডা অ-হ জ্ঞানবিশিষ্ট জীবও এখন বহু দেহবিশিষ্ট হয়েছে, যত জীব তত আমি, প্রত্যেক জীবেব অ হ স্বতন্ত্র। জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট ও পবায়ণ। তন্মধ্যে মানুষেব অ-হ বোধ (Ego) সবচেয়ে বেশী। একই জীব অসংখ্য দেহে অসংখ্য ভাবে বিরাজ করছে, সুখ দুঃখ অনুভব কবছে। জীব ও জগতেব স্থূলত্বকে নিম্নরূপে দেখানো যায়।

সূক্ষ্ম অবস্থা				স্থূল অবস্থা	
শান্ত ওঁ	ধ্বনিত	ম	চেতন	অ	জীব, দেহ, বহু
জ্ঞান		উ		হ্	
এক	এক	অ			
ও	হয়েও		জীব, এক	হ্ প্রকৃতি, জডপদার্থ, বহু	
অদ্বিতীয়	বহু				
		হ্	জড		

একই জ্ঞান স্বরূপ থেকে বহু আকারিত জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয়ে জ্ঞানেই অবস্থান কবছে। স্থূল দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ পৃথক। কাজেই উভয়কে পৃথক

ভাবে আলোচনা করা কর্তব্য বিবেচনা করে সূত্রকার প্রথম জগৎ সৃষ্টির পরিক্রম ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়ে বলছেন

ব্যোম-মরুৎ-তেজোঽপ্-ক্ষিতিঃ ॥৩॥

সূত্রার্থঃ ব্রহ্ম থেকেই ক্রমে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতিব সৃষ্টি হল।

English Translation :—Out of the Absolute emerged 'Byom', 'Marut', 'Tej', 'Apa' and 'Kshiti'.

নীনিকা: সৃষ্টিতে মিশ্র অবিমিশ্র অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান। প্রত্যেকটি পদার্থের উৎপত্তি, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে এক একখানা গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাই সৃষ্টি আলোচনা ক্ষেত্রে কেবল মূল বিষয় অবলম্বন করেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অন্যূন ৯২টি মৌলিক পদার্থেব সন্ধান পেয়েছেন। আরও বেশী আবিষ্কৃত হওয়াও সম্ভব। সত্য দ্রষ্টা ঋষিরা সমস্ত মৌলিক পদার্থকে পাঁচ পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং এক এক পর্যায়ের এক একটি ভূত নামকরণ করেছেন। এই হিসাবে ভূত পাঁচটি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম। এ দৃশ্যমান জগৎ পঞ্চ ভূতেরই সমাহার। সৃষ্টিতে যতকিছু আছে তার সব কিছু এ পঞ্চভূতের কোন না কোন পর্যায়ভুক্ত হবে। পঞ্চভূতের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। কাজেই সৃষ্টি বলতে ধরে নিতে হবে পঞ্চভূতেরই সৃষ্টি। এ পঞ্চভূতের সৃষ্টি কি করে হয়েছে জানতে পারলেই জগৎ-সৃষ্টি কি করে হয়েছে জানা যাবে। পঞ্চভূত সৃষ্টি পরিক্রমা পর্যালোচনা করা যাক :—

স্পন্দনাদ্ ব্যোম ॥৪॥

সূত্রার্থ: স্পন্দন থেকে ব্যোম সৃষ্টি হয়।

English Translation : As the result of the vibration, 'Byom' came into being.

নীনিকা: পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্ঞানের ধর্ম জানা। জ্ঞানের জানার প্রচেষ্টায় জ্ঞানে জাগে স্পন্দন। এ স্পন্দনই বিন্দু বা কল্পনা বা সৃষ্টির কারণ।

স্পন্দন থেকেই সৃষ্টি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টির সূচনা হয়েছে মূল সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই। স্থান-কাল ভেদ তখন ছিল না। পার্থক্য এই যে মূল জ্ঞানসত্ত্বা অনাদি, আর সৃষ্টির আদি এ জ্ঞান সত্ত্বা। যে স্পন্দনের কথা বলা হল তার প্রথম স্পন্দনের ফলই হল আকাশ বা ব্যোম। এ আকাশ মহাশূন্য। আকাশ অসীম, অনন্ত এবং সর্বব্যাপ্য। আকাশ সূক্ষ্ম তবে সগুণ, ইহার স্বরূপ ধ্বনি। অর্থাৎ।

জ্ঞান > স্পন্দন > ব্যোম = ধ্বনি = অসীম।

ধ্বনি সর্বত্র বিরাজিত। সকল শক্তির মূল ধ্বনি। জীব জগৎ ধ্বনির মধ্যেই ডুবে আছে। তবে শ্রোত্র এ ধ্বনি অনুভব করে না। এ শব্দকে ultrasonic বলা যায়। আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি। বাতাসের প্রচণ্ড চাপ আমাদের দেহে আছে, তবু এ চাপ আমরা অনুভব করি না। তেমনি শব্দের মধ্যে ডুবে থাকলেও শব্দের শক্তি আমরা অনুভব করতে পারি না। শব্দের এত শক্তি যে শব্দ-শক্তিতে অণুকে পর্যন্ত ভাঙা যায়, কখন কখন শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আকাশের উড়ন্ত বিমান ভেঙে যায় (বিশেষ করে Dive দেবার সময়)। ধ্বনি যে কি রহস্যে ভরা তা ধ্বনিতে উপনীত না হলে বুঝা যায় না। উপায়-বিশেষ অবলম্বনে ধ্বনির স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। তখন ধ্বনি যে জ্ঞানের স্পন্দন তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানে উপনীত হতে গেলেও এ শব্দ অবলম্বন করেই যেতে হয়। এবং একবার জ্ঞানে উপস্থিত হলেই বুঝা যায় যে জ্ঞানই অনাদি এবং সৃষ্টির আদি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জ্ঞানে উপনীত হয়েই জানতে পেরেছেন যে জ্ঞানের স্পন্দন মূলেই সৃষ্টি হয়েছে আকাশ।

এ স্পন্দনের দুটি তরঙ্গ বা Wave আছে ; তরঙ্গ দুটি হল ১। সময় = কাল (Time) এবং ২। বিস্তার (space)। গণিতের ভাষায় আমরা তাকে সরল রেখা এবং বৃত্ত রেখাও বলতে পারি। সময় ও বিস্তার উভয়ই অসীম ; কিন্তু উভয়ে আপেক্ষিক। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক সূত্র (বা Theory of Relativity) এখান থেকেই আরম্ভ হল। বস্তুত ব্রহ্ম নিরপেক্ষ ; সময় ও বিস্তারের কোন পার্থক্য সেখানে নেই। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে মনে হয় সৃষ্টির আরম্ভ থেকে কত কোটি কোটি বছর সময় অতিক্রম করে গেছে, একটি নক্ষত্র থেকে আর একটি নক্ষত্র কত কোটি কোটি মাইল দূরে, কিন্তু নিরপেক্ষ ব্রহ্মে উপনীত হলে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় যে এক মুহূর্ত সময়ও অতিবাহিত হয়নি, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিন্দুমাত্র দূরত্ব নেই। বস্তুবিজ্ঞানের

পক্ষে এ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিকট তা সম্ভব। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা এ সত্য উপলব্ধি করে তবে বলে গেছেন। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দূরত্ব থাকলেও সমস্তই একই আকাশে অবস্থিত আছে। আকাশের নিকট আকাশ দূর নহে।

এবারে পরবর্তী সূত্রের প্রতি মনোযোগী হওয়া যাক—

আকাশাৎ মরুৎ ॥৫॥

সূত্রার্থ: আকাশ থেকে মরুৎ জন্মালো।

English Translation Out of Byom Marut came into being

লৌকিকা: আকাশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আকাশের স্বরূপ হল ধ্বনি। ধ্বনির ধর্ম শব্দায়িত হওয়া। শব্দ হলেই তার একটা গতি (motion) হয়। এই গতির ফলে শব্দ থেকে সৃষ্টি হল মরুৎ—মরুৎ শব্দেরই বিবর্ত। মরুৎ সগুণ। মরুতের স্বরূপ স্পর্শ। অর্থাৎ—

ধ্বনি > গতি - মরুৎ।

মরুতের সাধারণ অর্থ বাতাস। কিন্তু মরুতের অর্থ ভিন্ন। মরুৎ হল ইথারীয় বিদ্যুৎ সত্ত্বা। মরুৎ সসীম। সময় ও বিস্তার দ্বারা সীমায়িত। মরুৎ গতিশীল। গতিশীল যা তাই অস্থির। যা অস্থির তাই স্থানান্তরিত হবার প্রয়াস পায়। স্থানান্তরিত হতে গেলে কিছু সময় লাগে এবং বিস্তারের কিছু পরিক্রমা করতে হয়। ফলে সৃষ্টি হল দূরত্ব। অর্থাৎ মরুৎ স্পন্দনের দুটি তরঙ্গ—

১। গতি (Motion) এবং ২। দূরত্ব (Distance) বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি উত্তর ও দক্ষিণ।

টিকা: এতৎ সঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল। মরুৎকে আকাশের বিবর্ত বলা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে আকাশ কি ব্রহ্মের বিবর্ত। উত্তরে বলব যে স্বরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়। যেহেতু কার বা ভ্রান্তির জন্য শব্দব্রহ্ম বা বিরাটের সৃষ্টি সে বিরাটেরই বিবর্ত চলছে। শব্দ বা ধ্বনির বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে মরুৎ। বিবর্তন স্বরূপ-ব্রহ্মের মধ্যেই হচ্ছে, কিন্তু স্বরূপ-ব্রহ্মের নয়।

এখন আবার বিবর্তন প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য পরবর্তী সূত্রের প্রতি মনোযোগী হওয়া যাক—

মরুতঃ তেজঃ ॥৬॥

সূত্রার্থ : মরুৎ থেকে তেজের উদ্ভব হয়।

English Translation —The 'Maruta' transmuted itself into 'teja.'

দীপিকা : বলা হয়েছে মরুৎ গতিশীল। গতি থাকলেই বেগ থাকবে। যেখানে বেগ সেখানেই তেজ। তেজ কি ? তেজ হল বায়বীয় যত কিছু আছে সব কিছুর আদি কারণ। হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতির কারণ হল তেজ। সব কিছুই তেজজাত। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারা যায় তেজ হল পরমাণু-সত্ত্বা। সূর্য, নক্ষত্র সবই তেজজ। তেজ থেকেই বস্তু জগতের সৃষ্টি।

তেজ ও সসীম, মরুৎ দ্বারা সীমায়িত মরুজ্জাত তেজের স্বরূপ হল 'ভা' বা রূপও বলতে পারি। সূর্য নক্ষত্র সব কিছুই রূপযুক্ত ও দৃষ্ট। তেজ তরঙ্গের দুটি Wave আছে—

১। দীপ্তি (Sight) ২। অন্ত (Limit)

দীপ্তির জন্য সব কিছু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দেখার একটা শেষ আছে—কোন কিছু এক সঙ্গে অর্দ্ধেকের বেশী দেখা যায় না।

টিকা : নেবুলার সূত্রের ব্যাখ্যাতা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে বাষ্পপিণ্ডকে বা নীহারিকাকে পৃথিবীর আদি কারণ বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে তো এই তেজেরই অংশ, বা তেজই। তেজ কোথা থেকে এল আধুনিক বিজ্ঞান তা বলতে পারে না। বর্তমান সূত্র আলোচনায় এখন বুঝতে পারা গেল যে জ্ঞানে যে ধ্বনি উঠেছিল সেই ধ্বনিই বিবর্তিত হয়েছে মরুতে এবং মরুত বিবর্তিত হয়েছে তেজে।

এবারে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পরবর্তী সূত্রের প্রতি ধ্যান দেওয়া যাক—

তেজস আপঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ : তেজ থেকে আপ সৃষ্টি হয়।

English Translation : The 'tej' turned into 'apa.'

দীপিকা : বলা হয়েছে যে মরুৎ থেকে তেজের সৃষ্টি হয়েছে। এ তেজ

সবেগে ঘুরতে ঘুরতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশের সর্বত্র। এ বিচ্ছিন্ন তেজকেই আমরা আকাশে নক্ষত্র-নক্ষত্রপুঞ্জরূপে দেখি। আকাশ অসীম কিন্তু নক্ষত্রগুলো সসীম। নক্ষত্রগুলো স্ব-বেগবশে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তেমনি একই তেজের অংশীভূত বলে তাদের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণও রয়ে গেল। এর নাম মহাকর্ষণ। সৃষ্টির প্রথম থেকেই এ দৃশ্যমান জগৎকে ধারণ করে আছে এ মহাকর্ষণ। ইহা ব্রহ্মেরই আকর্ষণ।

আমরা আগেই বলেছি যে তেজ নিজ গতি বশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এ গতি বিক্ষেপণাত্মক। আবার বিক্ষিপ্ত তেজরাশি যে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে সে গতি আকর্ষণাত্মক। এ আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক দুই গতিই সৃষ্টিকে স্থূলত্বে আনীত করেছে।

যে নক্ষত্রগুলোর কথা বলা হয়েছে তারই একটি আমাদের সূর্য। এ সূর্য এক সময় আরও বড় ছিল। স্ব-গতিবশে আপন পথে চলতে চলতে সূর্য থেকে কয়েকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এ অংশগুলোই গ্রহ-উপগ্রহ। তারই একটি আমাদের পৃথিবী

টিকা: এই ঘটনাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা তাদের Planetesimal Hypothesis এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত সূত্রের প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর এক বিরাট নক্ষত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে আর এক বিরাট নক্ষত্রের পাশে এসে পড়ায় সূর্যের গায়ে জোয়ারতরঙ্গ (Tidal wave) সৃষ্টি হয় ও সূর্যের একঅংশ বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে সৃষ্ট হয় গ্রহরাজি। কিন্তু তা ভুল। বিরাট নক্ষত্র সূর্যের অংশ ছিন্ন করলে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বিরাট নক্ষত্রের গায়ে চলে যেত। কিন্তু তা যায় নি। তা ছাড়া চন্দ্রের সৃষ্টি হল কি করে? কোন নক্ষত্রের আকর্ষণে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের সৃষ্টি হল? অনুমান থেকে তা স্পষ্ট হয় না। বস্তুত গতিবশে তেজই ছিন্ন হয়েছিল। সূর্যের গতির জন্যই সূর্যের তেজাংশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আবার পৃথিবী যখন তেজসদৃশ ছিল তখনই তার অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমাবস্থায় পৃথিবী তেজসদৃশই ছিল। ক্রমে আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার ফলে তেজ থেকে অপ জন্মাল। অপ কিন্তু ঠিক জল নয়। অপ হল বায়বীয় সত্তা। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড এজন্যে অপ্‌কে "aerial water" বলেছেন। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সব কিছুই 'অপ'। তন্মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির মিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে বায়ুমণ্ডল, এবং কেবল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক মিলনে হয়েছে জল। কাজেই জল ও বায়ু উভয়ই অপের অঙ্গ। অপ শব্দ এ জন্য বহুবচনান্ত। অপ তেজ থেকেও সসীম। অপের স্বরূপ রস। অপের ধর্ম দুই—

১। স্থূলত্ব (grossness) এবং ২। গ্রহতা (absorbability) অপ স্থূল। তাই অপকে বিভাগ করা চলে। কিন্তু জল জলে বাতাস বাতাসে, সহজেই মিশে যায়।

এবারে সৃষ্টিবিষয়ক পররবর্তী সূত্র আলোচনা করা যাক--

অদ্ভ্যঃ ক্ষিতিঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থঃ অপ থেকে ক্ষিতির সৃষ্টি হয়েছে।

English Translation . Out of Apa, Kshiti was formed.

দীপিকাঃ অপের ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হল ক্ষিতি। ক্ষিতি বলতে কেবল মাটি বুঝায় না। ক্ষিতি হল Rock মাটির সঙ্গে যাবতীয় কঠিন পদার্থই ক্ষিতির অন্তর্গত। ক্ষিতির স্বরূপ গন্ধ। ক্ষিতির ধর্ম দুই—

১। স্থিরত্ব (immobility) এবং ২। স্বাতন্ত্র্য (separateness) ক্ষিতি স্থূলপদার্থ। ইহা নিজের ইচ্ছায় চলতে বা থামতে পারে না। আবার ক্ষিতির দুই পৃথক অংশ সহজে মিশে যায় না।

টিকাঃ জীবদেহ পঞ্চভূত গঠিত। যদিও সব দেহ একই পদার্থে নির্মিত তবু পৃথক পৃথক দেহযুক্ত জীব নিজেকে পৃথক বলে মনে করে।

জগৎ-সৃষ্টি-তত্ত্ব বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে জগৎ ব্রহ্মেই সৃষ্ট হয়েছে। সব কিছুর আদি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম শান্তস্বরূপ। তাতেই স্পন্দন উৎপন্ন হওয়ায় ধ্বনি বা শব্দের সৃষ্টি হয়। শব্দ মরুতে, মরুত তেজে, তেজ অপে এবং অপ ক্ষিতিতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এ পরিণামই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ। বুঝবার সুবিধার জন্য সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বকে একটি ছকে প্রকাশ করা গেল—

Eternal

- জ্ঞানসত্ত্বা, নির্গুণ, অরূপ → অনাদি ও অসীম
- ↓
- ব্যোম, মহাশূন্য, সগুণ, ধ্বনি → অসীম কিন্তু অনাদি নয়

↓

Temporal

- মরুৎ, স্পর্শ → সসীম, অদৃশ্য
- ↓
- তেজ, রূপ → সসীম, দৃশ্য
- ↓
- অপ, রস → স্থূল, সচল
- ↓
- ক্ষিতি, গন্ধ → স্থূলতম, অচল

পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীও বিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রচুর গবেষণা করেছেন। লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) এর মতে পৃথিবীর বয়স ২,০০০,০০০,০০০ বছর। ততদিন ধরে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে বর্তমান ভূপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে এবং তাতে ক্রমে উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মেছে। মানুষ পৃথিবীর অন্যতম প্রাণী।

তর্ক : পূর্বে কোন কোন সূত্রের টীকায় বস্তুবিজ্ঞানমত খণ্ডন করা হয়েছে। অথচ এখানে বস্তুবিজ্ঞানমতকেই গ্রহণ করা হল তা কিরূপ ?

সমাধান : অজ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তাই উপযুক্ত বিজ্ঞান-মত গ্রহণ করা অবিধেয় নয়। বস্তুবিষয়ে বস্তুবিজ্ঞানমতকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। আদিকারণ (ultimate cause) বিষয়ে বস্তুবিজ্ঞানের ভ্রান্ত মতকেই খণ্ডণ ও অস্বীকার করা হয়েছে, এবং তা ঠিকই হয়েছে। প্রসঙ্গত বস্তুর আলোচনা এসে পড়ে ; কিন্তু আমাদের আলোচ্যবিষয় বস্তু নয়। আত্মা বা ব্রহ্ম বা জ্ঞানই আমাদের আলোচ্য। সেখানেই বস্তুবিজ্ঞানমত অচল।

এখন মানুষের সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে, কিভাবে বিবর্তন মাধ্যমে মানুষ বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

চেতনাদ্ উপলব্ধিমৎ সূক্ষ্মজীবনম্ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ : চেতনা থেকেই উপলব্ধির ক্ষমতাযুক্ত সূক্ষ্ম জীবন সৃষ্ট হয়েছে।

English Translation : Life with perceptive senses flowed from the Absolute Consciousness Jnanam.

লীনিকা : আমরা পূর্বেই বলেছি যে সৃষ্টির আদিস্বরূপ একমাত্র জ্ঞানসত্বাই আছে। জ্ঞানই চেতনা। চেতনা নির্গুণ। জীব সবকিছু উপলব্ধি করে চেতনা দিয়ে। বাহির-প্রকৃতি যে ভাবে উপলব্ধি করায় চেতনা সেভাবে বাহিরকে বুঝে। দুঃখের ঘটনা চেতনাকে কাঁদায়, সুখের ঘটনা চেতনাকে হাসায়। চেতনা নির্গুণ বলেই যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে সে অবস্থাই উপলব্ধি করে। জলের আকার নাই বলেই জল যে প্রকার পাত্রানুযায়ী আকারিত হয়ে উঠে চেতনার উপলব্ধি অনেকটা এবম্প্রকারই। চেতনাও জ্ঞানই। জ্ঞানের ধর্ম জানা। জানতে গেলে প্রচেষ্টা, তার ফল স্পন্দন। স্পন্দনের ফলে সৃষ্ট হল ধ্বনি একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ ধ্বনিকে উপলব্ধি করার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট হল শ্রোত্র। ধ্বনি থেকে সৃষ্ট হল মরুৎ, মরুৎকে উপলব্ধি করার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট হল স্পর্শ। মরুৎ থেকে হল তেজ। তেজকে জানার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট হল দর্শন। তেজ থেকে সৃষ্ট হল অপ্। অপ্‌কে জানার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট হল জিহ্বা। অপ থেকে সৃষ্ট হল ক্ষিতি। ক্ষিতিকে জানার জন্য চেতনাতেই সৃষ্ট হল নাসিকা। জ্ঞানে জানার প্রচেষ্টার স্পন্দনের যেমন সৃষ্ট হয়েছে পঞ্চভূত, তেমনি পঞ্চভূতকে জ্ঞান যে যে উপায়ে জানে সে সে উপায়গুলিই হল পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে পঞ্চভূত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিষয়টিকে নিয়ে বর্ণনা করা গেল—

নির্গুণ সত্ত্বা জ্ঞান বা চেতনা } → জগৎ —— জীবন ; ব্যোম ↑↓ শ্রোত্র → মরুৎ ↑↓ স্পর্শ → তেজ ↑↓ চক্ষু → অপ ↑↓ জিহ্বা → ক্ষিতি ↑↓ নাসিকা

জড় ও জীবন পৃথক হলেও আপেক্ষিক। জীবনের নিকটই জড়ের

অস্তিত্ব। পঞ্চভূতের অস্তিত্ব পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিকটই। জগতের অস্তিত্বও জীবের নিকটই।পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভাব হলে পঞ্চভূতেরও অভাব হয়; জীবের অভাব হলে জগতেরও অভাব হয়। জীব ভিন্ন জগৎ যেমন অর্থহীন, জগৎ ভিন্ন জীবও অসম্ভব। জীবন না হলে যেমন জড়ের অস্তিত্ব থাকে না তেমন জীবনও জড়কে আশ্রয় না করে অবস্থান করতে পারে না।

কাজেই জগৎসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি পৃথক ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ জীবসৃষ্টি ও জগৎসৃষ্টি একই ঘটনা। জগৎ যেমন জ্ঞান থেকেই উদ্ভূত জীবনও সেই জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। উভয়ই সমসাময়িক ও সম্ভূত।

এ বিষয়ে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করে বলছেন

সূক্ষ্মাৎ স্থুল-দেহী ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ: সূক্ষ্ম জীবন থেকেই স্থুলদেহী জীবের জন্ম।

English Translation : The sentient life embodied into the infusoria.

লীনিকা: পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্ঞান থেকে পঞ্চভূতময় জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবনেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ জীবনই সূক্ষ্ম জীবকোষ। সূক্ষ্ম জীবকোষও জ্ঞানময়ই। এর স্থুল প্রকাশকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সজীব প্রোটোপ্লাজম নাম দিয়েছেন। প্রোটোপ্লাজমই আদি জীবন-সত্ত্বা। সে জীবন-সত্ত্বা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যত জীবাণু ও জীব, এককোষী কিংবা বহুকোষী। এককোষী এ্যামিবা একটি জীব। কিন্তু এ্যামিবা জীবনের আদি নয়। এ্যামিবা জীবনের কার্যমাত্র।

সূক্ষ্ম জীবন থেকে স্থুল জীবকোষের সৃষ্টি কি করে হল, এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলছেন

ক্রিয়াযোগাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ: ক্রিয়াযোগেই সূক্ষ্ম জীবন স্থুল জীবকোষে রূপান্তরিত হয়েছে।

English Translation : It is the action which has caused the sentient soul to get embodied.

লীনিকাঃ তাৎপর্য এই যে ক্রিয়াযোগেই জীবনের স্থূলত্ব-প্রাপ্তি বা দেহ-ধারণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জানার চেষ্টায় জ্ঞানে একটা স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এ স্পন্দন থেকে একটি বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া (হকারের) এবং আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার (প্রণবের) সৃষ্টি হয়। এ ক্রিয়া দুইটি প্রত্যেক জীব-দেহে বর্তমান। জীব যখন শ্বাস গ্রহণ করে তখনই আকর্ষণাত্মক ক্রিয়া অনুভব করে, আবার যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া অনুভব করে। এ ক্রিয়া দুটিই জীবের দেহকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখে। যখনই ক্রিয়া দুটি বন্ধ হয় তখনই জীবন থেকে দেহ খসে পড়ে। এর নাম দেহের মৃত্যু। এ ক্রিয়া দুটির মধ্যে বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়া যতই প্রবল হতে থাকে ততই স্থূলত্বের বৃদ্ধি পায়। বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়ার প্রাবল্যেই তেজ একসময় বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এ ক্রিয়ার জন্যই সূক্ষ্ম জীব স্থূল জীবকোষে আত্মপ্রকাশ করল। এ ক্রিয়ার ফলেই ধীরে ধীরে জীব বহু হতে লাগল। ক্রমে এককোষী জীবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজালো। তার ক্রমোন্নতিতে ধীরে ধীরে বর্তমান মানুষের সৃষ্টি হল। বস্তুতঃ সেই সৃষ্টিক্রম আজও চলছে। আজও সেই এককোষী অবস্থা থেকেই মানবদেহের উৎপত্তি হয়।

দেহসৃষ্টির তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টির একটা ইচ্ছা বা কামনা জাগে। স্ত্রীপুরুষ ভিন্নদেহযুক্ত হলেও উভয়ের ইচ্ছা এক। অবশ্য মানুষের জীবনে বহু কৃত্রিমতা সৃষ্টি হওয়ায় প্রায়ই স্বাভাবিকতার ব্যাভিচার দেখা যায়। অনেক সময় সৃষ্টিকামনা ব্যতিরেকে কেবল ভোগকামনায়ও স্ত্রীপুরুষ সময়ে অসময়ে উপগত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রাণীর মধ্যে এ বিষয়ে কোন ব্যভিচার দেখা যায় না। কোন প্রাকৃতিক প্রাণী অঋতুতে উপগত হয় না। মানুষ প্রকৃতির বিরোধিতা করলেও প্রকৃতিকে আজও ছেড়ে যেতে পারেনি। নারী ঋতুমতী হলে পুরুষ-আসঙ্গ স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষা করে। এটাই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা—সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই এক। স্ত্রীদেহ পুরুষ-দেহ পৃথক। উভয়েরই ভোগলিপ্সা পৃথক হলেও সৃষ্টির ইচ্ছা এক। উভলিঙ্গ প্রাণীর (bi-sexual creatures) মধ্যে সৃষ্টির কামনা দুই উৎস থেকে উৎসারিত হয় না। বস্তুতঃ এ ইচ্ছা জ্ঞানেরই। ঋষিরা "সঃ অকাময়ত", "বহুস্যামঃ" ইত্যাদি ভাষা দ্বারা সে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। একই আত্মা বা জ্ঞান স্ত্রীপুরুষে বর্তমান। সেই জ্ঞানের ইচ্ছাই স্পন্দনমূলে স্ত্রীপুরুষমারফতে প্রকটিত হয়। তখন স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয়।

স্ত্রীপুরুষের মিলনের ফলে স্ত্রীডিম্বকোষের সঙ্গে পুংশুক্রাণুর মিলন হয়। এরই ফলে মাতৃজঠরে ভ্রূণাকারে জীবদেহের সৃষ্টি হতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানের সে ইচ্ছাই ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। প্রথম অবস্থায় এককোষ রূপেই ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। সে জীবকোষ মাতৃজঠরেই বিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে তাতে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজায়। পূর্ণাঙ্গ হলে মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। বিবর্তনের মধ্যেই শিশু বৃদ্ধি পায়, ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়, তারপর মরে যায়। এই নিয়ম। সৃষ্টির প্রথম থেকেই এ নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল। আজও চলছে। সূক্ষ্ম জীবন থেকেই এককোষী জীবের সৃষ্টি হয়, তা থেকে মানুষ।

তর্ক: এতে ত ডারউইনের নিয়মই প্রকারান্তরে মানা হল। ডারউইনও ত বলেছেন যে এ্যামিবার ক্রমবিকাশেই ধীরে ধীরে জলচর, তা থেকে স্থলচর পশু, বানর এবং বানর থেকে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এককোষী থেকে মানুষ হয়েছে একথা মেনে নিলে ডারউইনকেই মেনে নেওয়া হয়না কি?

সিদ্ধান্ত: না, এতে ডারউইনের মত মানা হয় না। ডারউইনের মত থেকে এমত সম্পূর্ণ পৃথক। ডারউইনের মতে এ্যামিবার ক্রমবিকাশে হল বানর এবং পরে বানর থেকে মনুষ্য। এ মত সম্পূর্ণ ভুল। বানর থেকে কিছুতেই মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না—একথা পূর্বেই বিস্তারিত বলা হয়েছে। ডারউইনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। এখানে আমরা শুধু বলেছি যে এককোষী অবস্থা থেকেই মানবদেহের সৃষ্টি হয়। এ মত ডারউইন বাদে স্বীকৃত হতে বাধা নেই। তবে কিভাবে মানুষের সৃষ্টি হল?—এরূপ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপন করে বলছেন

মনুষ্যাৎ মনুষ্যঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ: মানুষ থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

English Translation : Man is born of man.

লীনিকা: মানুষরা মনুরই বংশধর, হনুর নহে। বস্তুতঃ মানুষ থেকেই যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তাই সত্য। মানুষের পূর্বপুরুষ মানুষই। এ হতে পারে যে প্রাচীন কালের মানুষ বর্তমান কালের মানুষের চোখে কদাকার ছিল। বিবর্তনের ফলে কদাকার রূপ লোপ পেয়েছে—মানুষ বর্তমান রূপ পেয়েছে। তবে বিভিন্ন স্থানের মানুষ এখনও যে বিভিন্ন রকমের দেখতে হয় তার কারণ ভৌগোলিক ব্যবধান—জলবায়ু, খাদ্য প্রভৃতির বৈষম্য।

মানুষ থেকেই মানুষ কি ভাবে সৃষ্ট হল তা আলোচনা করা যাক।—

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মানুষকে মনুর বংশধর রূপে বর্ণনা করেছেন। মনু কে? এ মনু মনুসংহিতাকার নন। মনু হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র।

শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা হলেন বিরাট, বা শব্দব্রহ্ম শান্ত পরমব্রহ্ম থেকে বিরাট বা শব্দব্রহ্মের, অর্থাৎ ওঁকার থেকে ম-উ-অ-হ্-এর, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা পূবেই আলোচনা করা হয়েছে। ওঁকার থেকে ম-উ-অ-হ্ বা শব্দব্রহ্মের উৎপত্তিকে পুরাণকারগণ বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার (পদ্মযোনির) উৎপত্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য কি দেখা যাক—

পুরাণ বর্ণনা করছে যে বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, এবং লক্ষ্মী তাঁর সেবা করছিলেন তখন কমলযোনীর উৎপত্তি হল। এখানে বিষ্ণু মানে ওকার বা জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত ও শান্ত। তাই বলা হচ্ছে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত। জ্ঞানের জানার ইচ্ছার নাম লক্ষ্মী (=রমা)। লক্ষ্মীর পরিচর্যার সময়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির অর্থ জানার প্রচেষ্টার জন্য জ্ঞানের ধ্বনিত হয়ে ওঠা। অর্থাৎ ওকারের ম্-উ-অ হ্ হওয়া।

সৃষ্টিপর্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে বিরাট থেকেই সৃষ্টির সূচনা হল। একদিকে যেমন পঞ্চভূতের সৃষ্টি হতে আরম্ভ হল অন্য দিকে এ পঞ্চভূত থেকে জানার জন্য জ্ঞানেই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত জীবন সৃষ্ট হল। সূক্ষ্ম জীবন ক্রিয়া প্রভাবে যে স্থূল জীবকোষে রূপান্তরিত হয়েছে এ কথাও পূবে বলা হয়েছে। ক্রিয়া বলতে আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া বুঝায়। ক্রিয়া দুটি যখন একত্রে প্রবাহিত হয় তখন তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার। কিন্তু বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াসমন্বয় দেখা যায়। একই সূর্য থেকে গ্রহগুলি জন্মালেও যেমন কোনটা সূর্যের কাছে কোনটা সূর্যের দূরে আছে, কোনটা ছোট কোনটা বড়, কোনটাতে দিবারাত্রির মান কম, কোনটাতে বেশী, কোনটাতে ৩৬৫¼ দিনে বছর হয়, কোনটাতে কম দিনে আবার কোনটাতে বেশী দিনে, ঠিক তেমনি একই বিরাট থেকে জীবন জন্মালেও বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াসমন্বয় হল। এ ক্রিয়াসমন্বয়ের বিভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন জীবকোষ বিভিন্ন গুণযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হল। এরূপে মৎস্যের গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে মৎস্য, সরীসৃপের গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে সরীসৃপ, পতঙ্গের গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে পতঙ্গ, কীটের গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে কীট, পক্ষীর গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে পক্ষী, পশুরগুণযুক্ত জীবকোষ থেকে

পশু এবং মানুষের গুণযুক্ত জীবকোষ থেকে মানুষ জন্মালো। যে জীবকোষে এ্যামিবারই গুণ ছিল তা এ্যামিবাই আছে।

এখন, এই মানুষের গুণযুক্ত প্রথম জীবকোষের নামই মনু। ব্রহ্মার মন অর্থাৎ ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন তাই মনু। আজও মনু থেকেই মানব জন্মায়—অর্থাৎ মানুষের গুণযুক্ত এককোষী অবস্থা থেকেই মানুষ জন্মাচ্ছে। মানুষের জীবনে একইভাবে বিবর্তন চলেছে। জন্মের পরও মানুষ বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে বিবর্তন করে। রূপ ক্রমশই বদলায় কিন্তু মানুষ ঠিক থাকে। মানুষের গুণযুক্ত ক্রিয়াই মনুষ্যত্বের কারণ। মানব দেহে সাধারণত মানবগুণযুক্ত ক্রিয়াসমন্বয় থাকে। মানুষে মানুষে ভালমন্দ, সৎঅসৎ, ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয় তার মূলেও ক্রিয়া। যার ক্রিয়া যত ঊর্ধ্বে সে তত স্নেহ পরায়ণ হয়, ভাবুক হয়, প্রেমিক হয়, আধ্যাত্মিক হয়। যার ক্রিয়া যত নিম্নে সে তত ভোগী হয়, স্বার্থপর হয়, বঞ্চক হয়। এমন কি যার ক্রিয়া খুবই নিম্নে সে মানবদেহধারী হলেও পশুতুল্য হয়। ফ্রয়েড্ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকরা অবচেতন মন ও মানুষের ভাবপ্রবাহ নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। কিন্তু এ ক্রিয়াসমন্বয়ের বিষয়ে তাঁরা মোটেই অবিহিত নহেন। মানুষ ভাল করে মন্দ করে বা ভাবে এ ক্রিয়ার জন্য। ক্রিয়া মূলে সমস্ত দেহ ও দেহের মূল মস্তিষ্ক গঠিত হয়। ক্রিয়ানুরূপ মস্তিষ্কের আকার ও তার কার্য ও ভাবধারা। অতএব ক্রিয়াই সব কিছুর মূল। বানর থেকে মানুষে আসার মত কোন ক্রিয়াযোগ নেই। অতএব সিদ্ধান্ত করা গেল যে মানুষ থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

টিকা: মানবসৃষ্টির ব্যাখ্যায় পৌরাণিক রূপকের অবতারণা করবার জন্য বিষয়টি একটু জটিল হয়ে উঠেছে বিবেচনা করে এ টিকা প্রদত্ত হচ্ছে। স্পন্দনমূলে জ্ঞানে পঞ্চভূতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত অবস্থার নামই জীবাবস্থা বা জীবাত্মা। প্রথম জীবাবস্থা সূক্ষ্ম ছিল। ক্রিয়ামূলে স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। যে ক্রিয়া জীবকে স্থূলত্বে আনয়ন করে তার নাম অ-হ ক্রিয়া। এ অ-হ ক্রিয়ার সমন্বয়ের (Combination এর) তারতম্যের জন্য জীব এক এক প্রকার দেহ লাভ করেছে। অ-হ ক্রিয়ার কোন সমন্বয় জীবকে কাটদেহযুক্ত করেছে,—কোনটা মৎস্য, কোনটা পশু, কোনটা বা পক্ষী দেহবিশিষ্ট করেছে। এ ক্রিয়া সমন্বয়ই মানুষকে মানবদেহবিশিষ্ট করেছে। মানুষের গুণযুক্ত অ-হ ক্রিয়ার প্রভাবে প্রথম যে জীবকোষ সৃষ্ট হয়েছিল তার নামই মনু। মন বা ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষের ইচ্ছা থেকে জাত বলে মনু। মনুর বিকাশই মানব। আজকের মানুষ সে মানুষেরই বংশধর।

সমাপ্তোঽয়মধ্যায় চতুর্থঃ ॥

ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবর্তীবিরচিত-লীনিকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞান জানার প্রচেষ্টায় স্পন্দিত-ধ্বনিত হয়ে কি করে জীব ও জগৎ রূপ ভ্রান্তিতে আপতিত হয়েছে একথাও বলা হয়েছে। জ্ঞানস্বরূপ ওঙ্কার ঐ রূপ ভ্রান্তির লোকে এই রূপ জীবে আবর্তিত হচ্ছে। জ্ঞানের এই জীবাবস্থা খুবই দুঃখের। জীবন দুঃখ পূর্ণ। জীবনে যে সুখ পাওয়া যায় তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। অনেকেই তা বুঝে না। অনভ্যস্ত নাকে নস্যি দিলে বা অনভ্যস্ত কণ্ঠে তাম্রকূটধূম পান করলে দুঃখই হয়, এতে সুখ মোটেই পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্রমে অভ্যাসবশে সেই দুঃখটাই সুখ বলে মনে হয়। এ যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি জগতের যাবতীয় সুখই যে দুঃখেরই নামান্তর তাও ঠিক। সুখ যদি সুখের হত তা'হলে সুখ প্রাপ্তিতে লোক সুখীই হত। কিন্তু এত সুখ ভোগের পরও মানুষ সুখী হয় না কেন? মানুষ দুঃখেই আছে। তাই সুখ পেয়ে দুঃখ এঁড়াতে চায়। দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, সুখের বস্তুর সন্ধান করছে। সুখের বস্তু পেয়ে খানিকটা সুখও পায় কিন্তু সে সুখ থাকে না। প্রাপ্তিমাত্র নষ্ট হয়ে হয়ে যায়। রসগোল্লা খাওয়ার সময় মিষ্টি স্বাদ অনুভূত হয়, কিন্তু খাওয়ার পরই সে স্বাদ আর থাকে না, এ যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি সুখের সামগ্রী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সুখ পাওয়া গেলেও সে সুখ আর থাকে না, তাও নিশ্চিত। সুখ না থাকলেই আবার দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। কাজেই দুঃখকে যতই দূরে সরাবার চেষ্টা করা যাক না কেন, মানুষের দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হচ্ছে না, দুঃখ মানুষের থেকেই যাচ্ছে। এ অবস্থায় যখন জরা এসে উপস্থিত হয়, যে সুখ ভোগের মাধ্যমে মানুষ দুঃখকে সাময়িক বিরত রাখে অসামর্থের জন্য তাও যখন আর পারে না, তখন মানুষের দুঃখের সীমা থাকে না। তখন একটু ধর্ম-কর্ম করে মানুষ দুঃখ এঁড়াতে চায়। কিন্তু তাও পারে না। তারপর? সারাজীবন যতই অপটিমিজম (optimism) করুক না কেন সবই ভুয়ো হয়ে যায়, যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। মৃত্যু কোন যুক্তি, কোন দর্শন, কোন ইজমের অপেক্ষা রাখে না, মৃত্যু আসেই। কেউ মরতে চায় না। অথচ সকলকেই মরে যেতে হয় এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে।

সাধারণলোকের দুঃখবোধই নেই। মদ খেয়ে মাতাল রাস্তায় চলতে গিয়ে টলতে টলতে পড়ে যায়, গড়াগড়ি যায়, এতেই তার সুখ। তারা সুখে থাক। কিন্তু যারা দুঃখকে দুঃখ বলেই বুঝতে পারছে এবং দুঃখকে এড়াবার চেষ্টা করছে, অথচ যাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হচ্ছে না, তাদের মনে এ জিজ্ঞাসা সহজেই আসবে কি করে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কোন উপায় নেই? উত্তরে সিদ্ধান্তী বলবেন অবশ্যই আছে। কি উপায়? এর উত্তরে সূত্রকার সূত্র স্থাপনা করে বলছেন

আত্মদর্শনম্ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ। আত্মদর্শন দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়

English Translation : – The worldly pains & miseries can be overcome by the realisation of the self.

টীকা। মানুষের দুঃখ আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত সুখ দিয়ে দুঃখকে খানিক ঢেকে রাখা যদিও সম্ভব, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হলেও এভাবে তা সম্ভব হয় না। সাধারণত সুখের বস্তু দিয়েই দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। হাজার বস্তু ভোগ করেও দেখা যায় যে ভোগের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুখেরও শেষ হয়ে যায়। সুখেরই শেষ হয়, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতএব বুঝে নিতে হবে বস্তুর ভোগ দিয়ে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তবে কি মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা সম্ভব? অর্থাৎ শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, (Philosophy) প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব? তাও সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে শিল্প ও সাহিত্য আলোচনা বস্তুভোগেরই নামান্তর। প্রথমটা ভোগ, নামান্তরটা উপভোগ মাত্র। ভোগের চেয়ে উপভোগের দ্বারা দুঃখকে অধিকতর সময় ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও চিরতরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান ও দর্শনের (Philosophy) আলোচনা, এবং গবেষণা ভোগ ও উপভোগের পর্যায়ে না পড়লেও বস্তুনিরপেক্ষ নহে। বিজ্ঞান ও দর্শনে (Philosophy) বস্তুরই বিচার-বিশ্লেষণ চলে। বৈজ্ঞানিকের বা দার্শনিকের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। কাজেই বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। হলে পরে তাদের আর কোন জিজ্ঞাসা থাকত না।

জিজ্ঞাসা থাকলে বুঝতে হবে দুঃখের অবসান হয়নি। তবে কি দুঃখের অত্যান্তনিবৃত্তি কোন কিছুতেই হতে পারে না? উত্তরে সূত্রকার বলেন, আত্মদর্শন দ্বারাই দুঃখের অত্যান্তনিবৃত্তি হতে পারে কেননা হয়েছে। আত্মদর্শন যারা করেছেন তারাই এ সত্য উপলব্ধি করেছেন। দুঃখের অত্যান্তনিবৃত্তির কথা আর কেউ বলতে পারেন না, একমাত্র আত্মদর্শীরাই বলতে পেরেছেন যে দুঃখের অত্যান্ত নিবৃত্তি হয়। অতএব মানতে হবে আত্মদর্শন দ্বারাই দুঃখের অত্যান্তনিবৃত্তি সম্ভব হয়।

কিন্তু আত্মদর্শন বিষয়ক বিচার-মীমাংসার পূর্বে আমাদের জানা উচিৎ দুঃখ কিসের জন্য। জীবের দুঃখ কেন?—এরম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলেছেন

অভাবাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—অভাব থেকেই দুঃখ হয়

English Translation—Pain is generated by want

লীনিকা : দুঃখ কি একথা সম্যক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, দুঃখের অনুভূতি ও সকলের সমান নয়। কারো কাছে দুঃখটাই সুখ। কেউ অর্থ-সম্পদকে সুখের মনে করে, কেউ আবার বিষয়সম্পত্তির জন্যই দুঃখ পায়। কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনে সুখ পায় আবার কোন কোন স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনই দুঃখময় হয় ঋষিরা কিন্তু দুঃখের একটা বিশেষ সংজ্ঞা-প্রকরণ করেছেন। দুঃখ হল অভাববোধ। কেউ পড়ে হাত মচকালো, বা অসুখ ভোগ করল বা আত্মীয়স্বজন হারালো এসব দুঃখ দুঃখ হলেও আধ্যাত্মিক বিচারের আলোচ্য বিষয় নহে। এসব ত থাকবেই। আধ্যাত্মিক বিচারে দুঃখ বলতে অভাব-বোধই ধরে নিতে হবে। পরম সুখী ব্যক্তিরও এ অভাব বোধ আছে, অভাব বোধের হাত থেকে কোন প্রাণীই মুক্ত নয় বলেই পৃথিবীকে দুঃখময় বলা হয়েছে। দুঃখময় বলার অন্য কোন অভিপ্রায় নেই—এ সত্যের মধ্যে কোন রকমের নৈরাশ্যবাদ বা প্যাসিমিজমের সম্পর্ক নেই। এজন্য সূত্রকার 'দুঃখ'শব্দ ব্যবহার না করে 'অভাব' শব্দই ব্যবহার করেছেন, তাই যুক্ত।

মানুষ জন্ম থেকেই এক অপরিপূরণীয় অভাব অনুভব করে। এ অভাব পূরণ করার জন্যই মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ চেষ্টার মূলেই জাগতিক

যতসব উন্নতি—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, সংঘাটনিক, বাণিজ্যিক সাহিত্যিক, কি নয়। কিন্তু মানুষ যতই চেষ্টা করুক, উন্নতি করুক অভাব তবু তার মিটে না, বরং অভাব তার বাড়ছেই দিন দিন। পৃথিবীর সকলেই গরীব-নিঃস্ব নয়। ধনসম্পত্তির অধিকারীও বহু আছে, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষেরও অভাব নাই, সুনাম-সুযশও অনেকে পায়, পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েও বহু লোক আছে, তবুও মানুষের অভাব যাচ্ছে না। মানুষ সমান ভাবেই অভাব অনুভব করে। চাহিদার তৃপ্তি হলেও নিবৃত্তি কখনও হয় না। তবে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নাই যদ্বারা অভাবের নিবৃত্তি হতে পারে? সিদ্ধান্তী বলেন, আছে। এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে। এ বিষয়ে ঋষিদের শরণ নিতে হবে।

ঋষিরা বলেন মানুষের অভাব বস্তু বা বিষয়ের নয়। তাই বস্তু বা বিষয় ভোগের বা উপভোগের দ্বারা, এমন কি বিষয় সম্বন্ধীয় সকল খবর জানার দ্বারাও তার অভাবের নিবৃত্তি হয় না। হবার নয়। মানুষের (তথা সকল প্রাণীর) অভাব হল স্বভাবের। ভ্রান্তিবশে জ্ঞান যে প্রণব বা জ্ঞানস্বরূপ থেকে নেমে এসেছে সে স্বরূপে বা স্ব-ভাবে না যাওয়া পর্যন্ত আর অভাব মিটবে না। সৃষ্টির মূলে আছে এক ভ্রান্তি—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভ্রান্তি থেকে ভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়। জ্ঞানে ভ্রান্তির কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই জ্ঞানে সৃষ্টিরও কোনও অস্তিত্ব নাই। যার অস্তিত্ব নাই তাই অভাব। অভাব দিয়ে স্বভাবের অভাব দূর করা যায় না। দেহ দিয়ে আত্মার অভাব দূর হয় না বলেই জীব দেহযোগে অভাবরহিত হতে পারে না। আর অভাব রহিত হতে পারে না বলেই দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। অতএব দুঃখের নিবৃত্তির জন্য অভাবরহিত হতে গেলেই স্ব-ভাবের সন্ধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আত্মদর্শন হলেই স্বভাব ফিরে পাওয়া যায় আর তখন কোন অভাববোধ না থাকায় দুঃখ ও থাকে না বলেই সূত্রকার আত্মদর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান। আত্মজ্ঞান না হলে জানার তৃষার নিবৃত্তি হয় না।

আত্মা কি? এতৎ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেছেন

আত্মা পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ: আত্মা পরমাত্মাই।

English Translation : This soul is the Absolute Soul.

লীনিকা : প্রথমেই বলা হয়েছে যে মানুষের জানার তৃষা খবরের নয়, জানার তৃষা জ্ঞানেরই। আত্মা জ্ঞানই। আত্মজ্ঞান হলেই জ্ঞানের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের জ্ঞান হলেই স্বভাব বা স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। তখন জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞানে বিরাজ করে। জ্ঞান জ্ঞানময় হয়। জ্ঞানই থাকে কেবল।

যতদিন মানুষের দেহেই আমিত্ববোধ থাকে ততদিন আত্মা পৃথক ও সীমিত বলেই বুঝে। কিন্তু দেহ যে আমি নয়, একথা পূর্বেই প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান একবার হলে দেখা যায় যে আত্মায় পৃথকতা নাই, আত্মা অসীম এবং অনন্ত। আত্মাই পরমাত্মা। আত্মাই ব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম। আত্মাই জ্ঞান, সব কিছুর আদি। এইজন্য সূত্রকার আত্মদর্শনের কথা বলেছেন। কারণ যেহেতু অভাব আমাদের জ্ঞানের, এবং আত্মাই জ্ঞান, অতএব জ্ঞান লাভের জন্য আত্মদর্শন কর্তব্য। আত্মাই অভাব-রহিত অবস্থা।

এখন কথা হল আত্মাই যদি পরমাত্মা হয় বা জ্ঞান হয় তাহলে আত্মা সর্বব্যাপ্যও হবে। সর্বব্যাপ্য হলে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন। আত্মা বলে কোন বস্তু তো কোথাও পাওয়া যায় না। আত্মার খোঁজ করব কোথায় ? এবম্বিধ সংশয়াত্মক প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলেছেন

দেহ-পিণ্ডে ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ দেহের মধ্যেই আত্মার সন্ধান কবতে হবে।

English Translation : The self should be sought within the body.

লীনিকা :—সবব্যাপ্য হলেও কেন আত্মাকে সবত্র পাওয়া যায় না এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসুমাত্রেই এপ্রশ্ন করে থাকেন। প্রত্যেক পদার্থই অণুগঠিত। পদার্থের কোথাও অণু পাওয়া না গেলেও অণু পদার্থের সবত্র আছে তা যেমন সত্য, তেমনি জগতের কোথাও আত্মা পাওয়া না গেলেও আত্মা জগতের সবত্র আছে তাও সত্য। অণুর অস্তিত্ব যেমন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভিন্ন জানা যায় না, তেমনি আত্মার অস্তিত্বও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান ব্যতীত জানা যায় না। কোন কিছু পেতে গেলে জ্ঞানদিয়ে পেতে হয়। শব্দের জ্ঞান হলে আমরা শব্দ পাই, স্পর্শের জ্ঞান হলে আমরা স্পর্শ পাই। এরূপে যার জ্ঞান হয় তাই আমরা পাই। তেমনি আত্মার জ্ঞান হলেই আত্মাকে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়লব্ধ, তেমনি

আত্মার জ্ঞানও একমাত্র আত্মাদ্বারাই লাভ করা সম্ভব। জ্ঞান জ্ঞানগম্য বলে জ্ঞান দিয়েই তাকে জানতে হবে। এর অন্য উপায় নাই। জ্ঞানেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে বটে, অর্থাৎ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে বটে তথাপি বাইরে খুঁজলে জ্ঞানকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের সন্ধান দেহের মধ্যেই করতে হয়, তবেই পাওয়া যায়। H_2O = water, এ সত্য উপলব্ধি করা যেমন সমস্ত বিশ্বের জলরাশি আলোড়ন করলেও সম্ভব হয় না, তা করতে গেলে যেমন বৈজ্ঞানিককে একবিন্দু জল নিয়ে গবেষণাগারে বসে বিশ্লেষণ করে করতে হয় তেমনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে আত্ম-সত্য উপলব্ধি করা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও সম্ভব হয় না, তা করতে গেলে নিভৃতে দেহের অভ্যন্তরে তার সন্ধান করতে হবে। এ পিণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে এ দেহেও তা আছে। দেহ ব্রহ্মাণ্ডেরই সংস্করণ। H_2O = water এ সত্য একবিন্দু জলের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমনি সমগ্র জলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তেমনি এ দেহসম্বন্ধে যে সত্য প্রযোজ্য সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে সে সত্য প্রযোজ্য। দেহে কি সত্য নিহিত আছে তা জানলে ব্রহ্মাণ্ডে কি সত্য নিহিত আছে তাও জানা যাবে। কাজেই সত্যের বা আত্মার বা জ্ঞানের সন্ধান দেহের মধ্যেই করতে হবে।

এখন, এই সার্ধত্রিহস্তপরিমিত ক্ষুদ্র মানবদেহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু থাকা কি করে সম্ভব—এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে বিবেচনা করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করেছেন

স্পষ্টেঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থঃ সৃষ্টিপর্যায় আলোচনা করলে দেখা যায় দেহসৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি একই ভাবে হয়েছে।

English Translation : The body is created in the same way as the Universe.

লীনিকাঃ ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান এ দেহপিণ্ডেই আছে একথা অসম্ভব মনে হলেও সত্য। ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু এ দেহপিণ্ডেই আছে। একটি ক্ষুদ্রদর্শন বৃক্ষফলে যেমন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের সত্তা থাকে তেমনি এ ক্ষুদ্রদর্শন দেহেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকাও সম্ভব : একটি পরমাণুতে যেমন সমগ্র সৌরজগৎ বর্তমান তেমনি এ দেহেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। তা ছাড়া বিচা

করলে দেখা যায় যে যে উপায়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সে উপায়েই এ দেহেরও সৃষ্টি হয়। উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। দেহসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির কথা পুর্বেই বলা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তাই আবার সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। সৃষ্টিপর্যায়ে বলা হয়েছে যে জ্ঞানস্বরূপ প্রণবে জানার প্রচেষ্টায় হ্কার জন্য ধ্বনির বা অকাশের সৃষ্টি হল। আকাশ থেকে মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতির সৃষ্টি হল। এ পাঁচ নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। দেহ-সৃষ্টির মূলে আছে একটা ইচ্ছা। এ ইচ্ছা একটা স্পন্দন। এ স্পন্দনই নারীপুরুষের সংস্পর্শ ঘটায়। ফলে পুংশুক্র ও স্ত্রীরজ নারীগর্ভে নিষিক্ত ও সংচিত হয় এবং শুক্রাণুর সঙ্গে স্ত্রীডিম্বকোষ মিলিত হয়ে দেহের সৃষ্টি হয়। দেহ পঞ্চভূতেরই সমহার। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও দেহ একই। দেহস্থিত আত্মার জ্ঞান হলেই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পরমাত্মার জ্ঞান হয়। জ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে ব্রহ্মাণ্ড ও দেহ একই উপায়ে সৃষ্টি হলেও দুইটি পৃথক। এমনকি দুইটি মানব দেহই পরস্পর পৃথক এমতাবস্থায় দেহস্থিত আত্মাই যে পরমাত্মা এর প্রমাণ কি? তদূত্তরে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র বলছেন

প্রত্যক্ষ প্রমাণম্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ ঃ প্রত্যক্ষই প্রমাণ।

English Translation : Perception is the evident proof.

লীনিকা ঃ পুর্বে 'সাক্ষাৎ প্রমাণম্' বলে একটি সূত্রের উল্লেখ আছে। তাতে বলা হয়েছে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যখন যায় তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আত্মার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করে সূত্রকার প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করছেন। অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণ আছে, এবং তার উল্লেখ পুর্বে করা হয়েছে। তবে আত্মা যখন প্রত্যক্ষ করা যায় তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি। একবার আত্মদর্শন হলেই উপলব্ধি করা যায় যে আত্মাই পরমাত্মা। আত্মাই জ্ঞান, সৃষ্টির আদি, শান্ত পরমব্রহ্ম।

আত্মাকে যদি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ হয়, তা'হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আত্মাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

শ্বাসঃ ক্রিয়া ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থঃ দেহস্থ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্যেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়।

English Translation : The soul can be attained with the help of breathing action of the body.

লীনিকাঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে আত্মাদ্বারাই আত্মাকে জানতে হবে— উদ্ধারেদাত্মনাত্মানম্, গীতার এ মহাবাক্য মনে রাখতে হবে। কিন্তু আত্মাই ত জানা নেই, তবে কি ভাবে আত্মাদ্বারা আত্মা জানা সম্ভব! হ্যা সম্ভব। আত্মা জীবদেহে অহ্‌রূপে বিদ্যমান। 'অহ্'-জ্ঞান থেকেই অহং বা আমিত্ব-বোধ জন্মে। এ আমিত্ব কার? দেহের নয়। কারণ মৃতদেহে আমিত্ব-বোধ নেই। যে দেহে আত্মা নেই, মৃত, সে দেহে আমিত্ব থাকে না। যে দেহে আত্মা আছে সে দেহেই আমিত্ব বোধও আছে। অতএব বুঝতে হবে আমিত্ববোধটা আত্মারই, জীবরূপ আত্মার অর্থাৎ অহ-জ্ঞানের। দেহে আমিত্বের অবস্থান কি ভাবে বুঝা যায়? দেহের স্পন্দন দ্বারা। মৃত দেহের সঙ্গে জীবন্তদেহের তুলনা করলে দেখা যার মৃতদেহে কোন ক্রিয়া নেই, মৃতদেহ নিষ্পন্দ। অপর পক্ষে জীবন্তদেহ সদাস্পন্দনশীল। দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া অনবরত চলছে। এ ক্রিয়াই আমিত্বমূলক, যতক্ষণ এ ক্রিয়া আছে ততক্ষণ আমিত্বও আছে। অতএব বুঝতে হবে ক্রিয়াই আমিত্ব।

দেহের এ ক্রিয়া যে একটা বিশেষ কিছু, জীবের জীবন, একথাটা বুঝাবার জন্য সূত্রাকার বলছেন

ক্রিয়াভাবাৎ মৃত্যুঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থঃ এ ক্রিয়ার অভাবে মৃত্যু অনিবার্য।

English Translation : Absence of the action means death.

লীনিকাঃ দেহের ক্রিয়া এমন জিনিষ যে এর অভাব হলে মৃত্যু অনিবার্য। ক্রিয়ার অভাবে জীবদেহ মৃতদেহ রূপে পড়ে থাকে। মৃতদেহ সূচনা করে যে দেহে আত্মার সংযোগ নাই। তাহ'লে বুঝতে হবে যে এ ক্রিয়াই দেহকে

আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। ক্রিয়া বন্ধ হলেই দেহ আত্মা থেকে খসে পড়ে। এর নাম মৃত্যু। কাজেই জীবদেহের এ ক্রিয়া যে একটা বিশেষ কিছু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রিয়াই জীবের জীবন।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন, ক্রিয়াই জীবন হলে বা ক্রিয়াই আমিত্ব হলে কি ক্রিয়াই আত্মা—এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলছেন যে ক্রিয়াই আমিত্ব হলেও আত্মার স্বরূপঅবস্থা নয়; অর্থাৎ ক্রিয়ামূলক আমি-জ্ঞান ভ্রান্তি-জ্ঞান। জ্ঞানেব শান্তঅবস্থা নিষ্ক্রিয়। জ্ঞানের স্পন্দনমূলে এ ক্রিয়ার উৎপত্তি। ক্রিয়াটি আত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়, আত্মাই ক্রিয়ার আধার, দেহে তার ব্যাপ্তি হয়। ক্রিয়াটি যেন জোয়ার। চন্দ্রের আকর্ষণে জলেই জোয়ারের সৃষ্টি হয়, কিন্তু জলই জোয়ারের আধার। তেমনি স্পন্দনমূলে আত্মাতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, আত্মাই তার আধার। জোয়ার ও জলের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য ক্রিয়া ও আত্মার মধ্যে তেমন পার্থক্য। তবু জোয়ার যেমন জলেরই এক গতিযুক্ত অবস্থা ক্রিয়াও তেমনি আত্মারই এক গতিযুক্ত অবস্থা। কাজেই আত্মার জ্ঞানলাভ করতে গেলে এ ক্রিয়ার সাহায্যেই করতে হবে। আত্মাই ক্রিয়ার উৎস। কাজেই ক্রিয়ার সাহায্য *অবলম্বন করলে আত্মায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব। আত্মায় উপস্থিত হলেই আত্মা প্রত্যক্ষ হবে। আত্মদর্শন হলেই আত্মজ্ঞান হবে। তখনই বুঝা যাবে যে আত্মাই পরমাত্মা।

এখন, এ ক্রিয়া অবলম্বন করা সহজ কথা নহে। ক্রিয়া অবলম্বন করতে গেলে ক্রিয়ার স্বরূপ জানা দরকার। তাই ক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র স্থাপনা করছেন

আকর্ষণাত্মিকা বিক্ষেপণাত্মিকা চ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থঃ জীবদেহে দুইটি ক্রিয়া প্রবাহিত—একটি ঊর্ধ্বগ, আকর্ষণাত্মক, অপরটি নিম্নগ, বিক্ষেপণাত্মক।

English Translation: There are two flows of action in the body—one attractive and the other repulsive.

* টিকা: ক্রিয়া-সাহায্যে ধ্বনিকে অবলম্বন করে যেতে হয়। ধ্বনি অবলম্বনের কথা 'হংসমন্ত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে পরে বলা হবে।

লীনিকা : দেহে যে ক্রিয়া আন্দোলিত হচ্ছে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্রিয়া দুইটি। একটি নিম্নগ, বিক্ষেপণাত্মক, অপরটি উর্দ্ধগ, আকর্ষণাত্মক।

সৃষ্টির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে জ্ঞানের স্পন্দনের জন্য প্রণব ওঁকার থেকে হ্ নির্গত হল। ফলে ওঁকার ত্রিধা হয়ে ম্-উ-অ হল এবং তার থেকে হ্ নির্গত হল। হ্ এর নির্গমণই বিক্ষেপণ। তাই প্রথম ক্রিয়া। এখন প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। হ্ যখন বিক্ষেপণ ক্রিয়ার সৃষ্টি করে নির্গত হতে চলল তখনই অ-উ-ম্ তে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হল এবং হ্ কে আকর্ষণ করে রাখল। এই বিক্ষেপণ ক্রিয়া এবং আকর্ষণ ক্রিয়াই দেহে বিদ্যমান।

দেহে ক্রিয়া দুটির অবস্থান সম্বন্ধে সূত্রকার বলেছেন

সহস্রাবাৎ মূলাধারে ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ : ক্রিয়া দুটি সহস্রার থেকে মূলাধার (এবং মূলাধার থেকে সহস্রার) অবধি বিস্তৃত।

Enalish Translation : Of the flows (of action) the repulsive one originates in the medulla oblongata and ends in the sex-root and the attractive one, on the otherhand, originates in the sex-root and ends in the medulla oblongata.

লীনিকা : দেহে ক্রিয়া দুটির অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। হ্কারযোগে একাক্ষর প্রণব ত্রিধা হয়ে চার অক্ষর বা চতুর্বর্ণ* অর্থাৎ ম্-উ-অ এবং হ্ রূপে সৃষ্টির সূত্রপাত করে। এ বর্ণ চারিটি দেহে এখনও বিদ্যমান। তন্মধ্যে ম্ এর অবস্থান হল সহস্রারে, উ এর অবস্থান আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদলে, অ এর অবস্থান কণ্ঠে এবং হ্ এর অবস্থান হল মূলাধারে। হ্ মূলাধার থেকে প্রণবকে টানছে। ধ্বনিত প্রণবের আদি ম্ স্থান সহস্রার পর্যন্ত এটান পৌছাচ্ছে। আবার প্রণব হ্ কে টানছে। ফলে প্রণবের আদি ম্র টান হ্ স্থান মূলাধার পর্যন্ত পৌছাচ্ছে। এরূপে সহস্রার থেকে মূলাধার এবং মূলাধার থেকে সহস্রার অবধি ক্রিয়া দুটি আন্দোলিত হচ্ছে। এ ক্রিয়া দুটির আন্দোলনের নামই জীবন। ক্রিয়া দুটির কার্য হিসাবেই জীবন নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে কিঞ্চৎ আলোচনা করা উচিত।

---

*টিকা : গীতায় যে চতুবর্ণের কথা বলা হয়েছে তা এই চতুর্বর্ণ ; চার জাতি নহে।

ক্রিয়া দুটি সহস্রার থেকে মূলাধার অবধি বিস্তৃত। তন্মধ্যে বিকর্ষণ ক্রিয়ার অনুভূতি মানবদেহে মূলাধার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রবল, আবার আকর্ষণ ক্রিয়ার অনুভূতি মানবদেহে সহস্রার থেকে নাভিকেন্দ্র পর্যন্ত প্রবল। এ ক্রিয়া দুটি দেহে ঊর্ধ্বাধঃ প্রবাহিত হওয়ার কালে নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে মিলিত হয়। মানবদেহে ক্রিয়া দুটির মিলন ঘটে দুটি কেন্দ্রে। ঊর্ধ্বকেন্দ্র বা সন্ধিস্থল হল কণ্ঠ, নিম্নকেন্দ্র বা সন্ধিস্থল হল নাভি। তন্মধ্যে ঊর্ধ্বকেন্দ্র বা কণ্ঠসন্ধি হল জ্ঞানের অবস্থান এবং নিম্নকেন্দ্র হল মানুষের অনুভবের অবস্থান। কাজেই নিম্নকেন্দ্রকে ভাব সন্ধিও বলা যেতে পারে। নিম্নকেন্দ্র খুবই অস্থির। ক্রিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবসন্ধি মাপযন্ত্রের (chemical balance) মিটারের মত নাভিকেন্দ্রের ঊর্ধ্বে-অধেঃ উঠানামা করে এবং মনের ভাবের পরিবর্তন ঘটায়। মনের ভাবের পরিবর্তনের মূলেও ক্রিয়া। ক্রিয়া ও ভাব পরস্পর নির্ভরশীল। ক্রিয়ার এ ভাবসন্ধিঅবস্থার নাম দেওয়া যাক বিস্তার। কারণ নাম ব্যতীত কিছুই বুঝানো যায় না। এ ক্রিয়ার বিস্তার স্বভাবত যার দেহে যত ঊর্ধ্বমুখীন সে তত ভাবুক হয়, কবি হয়, দার্শনিক হয়, বিশ্বপ্রেমিক হয়, ঈশ্বর পরায়ণ হয়। এ ক্রিয়ার বিস্তার স্বভাবত যার দেহে যত নিম্নমুখীন সে ততই ভোগী হয়, স্বার্থপর হয়, নিষ্ঠুর হয়, দুরাচার হয়, নীচাশয় হয়। অনেক সময় শিক্ষা সভ্যতার প্রলেপে এ নিষ্ঠুরতা মার্জিত রূপ ধারণ করে। কিন্তু নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতা। একজন সিঁদেল চোর এবং একজন তহবিল তচ্ছ্রুপকারকের মধ্যে নীচাশয়তার কোন তফাৎ নেই। একজন খুনী ডাকাত এবং একজন হত্যাকারী রাজনৈতিক নেতার নিষ্ঠুরতার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নারীর উপর বল-প্রয়োগকারী ও অর্থপ্রয়োগকারী দুজনই সমান। দুজনের দেহক্রিয়ার বিস্তার অনুরূপ। এ ক্রিয়াবিস্তারই মানুষের প্রকৃতি নির্ণয় করে।

এক্ষণে, এ ক্রিয়াবিস্তার দেহের যে স্থানে সাময়িক স্থিতিলাভ করে মানুষ সেরূপ অনুভব করে। যখন এ ক্রিয়া-বিস্তার লিঙ্গদেশে স্থিতিলাভ করে, তখন মানুষ কামপীড়া অনুভব করে, যখন উদরে স্থিতিলাভ করে তখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, যখন বক্ষে স্থিতিলাভ করে তখন স্নেহপ্রীতির স্পর্শ অনুভব করে, যখন কণ্ঠে স্থিতিলাভ করে তখন প্রেমভাব বা দিব্যভাব বা ভগবদ্ভাব অনুভব করে। কাম ও প্রেমে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু তফাৎ। প্রেমভাবের ঊর্ধ্বে আর কোন ভাব নাই। কণ্ঠসন্ধিকে কণ্ঠে রেখে এ ক্রিয়াবিস্তার কণ্ঠের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। কাজেই কণ্ঠই ভাবের সীমা। ভাবের প্রাবল্যে

কখন কখন কণ্ঠবোধ হয়ে আসে। এব থেকে দেখা যায় যে ক্রিয়াবিস্তাব যাব দেহে যত উর্ধ্বে স্থিতিলাভ কবে তাব ভাব ও অনুভূতি ততই উন্নত হয়, অপব পক্ষে ক্রিয়াবিস্তাব যাব দেহে যত নিম্নে স্থিতিলাভ কবে তাব ভাব ও অনুভূতি ততই নিকৃষ্ট হয়। যাব ক্রিয়াবিস্তাব সবাবস্থায় নাভিব নিম্নে স্থিত থাকে সে মানবদেহধাবী হলেও পশুতুল্য। তাব মত হীনস্বভাবেব আব কেউ হয় না। মানুষ-পশু যত পশু, পশু-পশু তত পশু নয়।

এতক্ষণ ক্রিয়ায় নিম্নকেন্দ্র বা নিম্নসন্ধিব কথা আলোচনা কবা হয়েছে। এবাবে উর্ধ্ব কেন্দ্র বা সন্ধিব কথা আলোচনা কবা যাক।

ক্রিয়াব উর্ধ্বকেন্দ্র বা সন্ধিস্থল, পূর্বেই বলেছি, হল কণ্ঠ। বস্তুত কণ্ঠ-সন্ধিই সন্ধি। নাভিব সন্ধিব নাম দিয়েছিলাম বিস্তাব। কণ্ঠসন্ধির নাম দেওয়া যাক সন্ধি। সন্ধি ও বিস্তাবের মধ্যে পার্থক্য আছে বলেই পৃথক নাম।

এক্ষণে, ক্রিয়াব বিস্তার যেমন ভাবেব এবং স্থিতি অনুভবেব হেতু, তেমান ক্রিয়াব সন্ধি জ্ঞানেব ধাবক। ক্রিয়াসন্ধি খুব অস্থিব নয়, অর্থাৎ বিস্তাবেব মত ইহা সহজে নডাচডা কবে না। সাধাবণ অবস্থায় কণ্ঠই ক্রিয়াব সন্ধিস্থান। ক্রিয়াসন্ধি এমনিতে কণ্ঠেব উর্ধ্বে যায় না, এমন কি চেষ্টা কবেও তাকে কণ্ঠেব উর্ধ্বে তুলা দুষ্কব। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় দিনে একবাব বা দুবাব ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠেব নিম্নে নেমে আসে—নিদ্রাকালে।

যতক্ষণ ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠে অবস্থান কবে ততক্ষণ আমাদের জগদজ্ঞান। অ এবং হ্ তখন মিলিত থাকে বলে জ্ঞান অহংভাবে জীবরূপে আবদ্ধ থাকে। জীবেব ক্রিয়াসন্ধি যতক্ষণ কণ্ঠে আছে ততক্ষণ তার সুখদুঃখ, ভালমন্দ, সুন্দব অসুন্দবেব জ্ঞান এককথায়—জগতেব জ্ঞান, ততক্ষণ জীবেব জ্ঞানে জগৎই ভাসে, ততক্ষণ জীবেব কাছে জগৎই সত্য।

এ ক্রিয়াসন্ধি স্বভাবতই দিনে একবাব বা দুবাব কণ্ঠেব নিম্নে নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে জীব ঘুমিয়ে পডে। নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠেব নিম্নে নেমে যায় বলে হ্ তখন অ এব সঙ্গে অনুভবযুক্ত থাকে না। তখন হ্ ই প্রবল। হ্, পূর্বেই বলা হয়েছে, ভ্রান্তি বা মায়া বা অজ্ঞানতা। জ্ঞান তখন অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে পডে। ক্রিয়াসন্ধি অ (=কণ্ঠে) ব নিম্নে আসার সঙ্গে সঙ্গে অ হ্ অনুভবযুক্ত থাকে না বলে অহংরূপী জীবও থাকে না, জগৎও থাকে না। নিদ্রিত ব্যক্তিব আমিত্ব লোপ পায় এবং নিদ্রাবস্থায় জগৎও লোপ পায়। তখন জগৎ সত্য না মিথ্যা একপ জ্ঞানও থাকে না, কেন না জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। আবাব যথন স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠে ফিরে যায়

তখন আবার হং এর সঙ্গে যুক্ত হয়, অহংরূপী জীব জাগত হয় এবং জ্ঞানে তখন পুনরায় জগৎ ভেসে উঠে। জগৎ তখন আবার সত্য বলে মনে হয়।

তা'হলে দেখা যায় সর্বাবস্থায় জগতের অস্তিত্ব নাই একমাত্র অহং অবস্থাতেই জগতের অস্তিত্ব। অর্থাৎ ক্রিয়াসন্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত কণ্ঠে ততক্ষণ জগতের অস্তিত্ব থাকে, কণ্ঠচ্যুত হলে জগতের অস্তিত্ব থাকে না। নিদ্রাবস্থায় কণ্ঠচ্যুত হয়ে সন্ধি নিম্নে এলে আর জগৎ থাকে না। নিদ্রাব্যতীত কখন কখন কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাতেও ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠের নিম্নে আসতে পারে। তখনও জীব মূর্ছিত, অজ্ঞান হয়ে যায়। জগতের কোন অস্তিত্ব তখনও থাকে না।

ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠের নিম্নে এলে যেমন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ক্রিয়াসন্ধিকে কণ্ঠচ্যুত করে কণ্ঠের ঊর্ধ্বে তুলে নিতে পারলেও আর জগতের অস্তিত্ব থাকে না। জগৎ তখন লোপ পায়। ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠের ঊর্ধ্বে থাকা হেতু হং তখন জ্ঞানের সঙ্গে অনুভবযুক্ত থাকে না। জ্ঞান তখন হং মুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানমুক্ত অবস্থায় থাকে। জ্ঞানে তখন কেবল জ্ঞানই থাকে। তখন জীবও থাকে না জগৎও থাকে না। এ অবস্থায় জ্ঞানই সত্য। জগৎ অস্তিত্বহীন বলে মিথ্যা। কারণ যার অস্তিত্ব নাই তাই মিথ্যা।

আবার যখন ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠে ফিরে আসে তখন জ্ঞান (অবিন্দু) হং এর সঙ্গে অনুভবযুক্ত হয়। হং ভ্রান্তি। ভ্রান্তিযোগে আবার জগৎসৃষ্টি হয়, জ্ঞান অহংভাবে জীবরূপে আবার জাগতিক সুখদুঃখ, ভালমন্দ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করে। কাজেই দেখা যায় ভ্রান্তিই (হংকার) জীব ও জগতের কারণ। ভ্রান্তিবশেই সৃষ্টি। ভ্রান্তি না থাকলে জীব ও জগৎ থাকে না। ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠের ঊর্ধ্বে গেলে সৃষ্টি লোপ পায়। কৌশলবিশেষের যোগে ক্রিয়াসন্ধি কণ্ঠের ঊর্ধ্বে তোলা সম্ভব। কখন কখন আকস্মিক আঘাত, দৈহিক বা মানসিক, বশেও সাময়িকভাবে ক্ষণিকের জন্য ক্রিয়াসন্ধি ঊর্ধ্বে উঠে। জীব তখন চোখে সরষাফুল দেখে, এবং তন্মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সরষাফুল আর কিছুই নয়। জ্ঞানেরই এক আকস্মিক বিদ্যুজ্ঝলক মাত্র। আকস্মিক আঘাতে কণ্ঠচ্যুত জ্ঞান সাময়িক কণ্ঠের ঊর্ধ্বে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে কণ্ঠের নীচে। জীবও ক্ষণিক সরষাফুল দেখে আবার মূর্ছিত, অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবে কৌশলবিশেষ যোগে স্বেচ্ছায় ক্রিয়াসন্ধিকে কণ্ঠের ঊর্ধ্বে তুলে নিলে প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান স্থিতিলাভ করে। জ্ঞানের প্রকাশকে নির্ধূম অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই অবস্থায় জ্ঞান যখন

বস্থান করে তখন জগৎ থাকে না। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যেমন মিথ্যা হয়ে যায়, ানলাভে জগৎও তেমনি মিথ্যা হয়ে যায়।

এ আলোচনা থেকে এ পর্যন্ত বুঝা যায় যে জীবের জ্ঞানের অবস্থা নির্ভর রে তার ক্রিয়াসন্ধির উপর। ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠের উপরে তখন জ্ঞানে ানই বিরাজিত থাকে। ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠের নিম্নে থাকে তখন জ্ঞান জ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। আর ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠে তখনই জ্ঞানে জগৎ থাকে। ণ্ঠে জ্ঞানের সংগে ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা (অর্থাৎ জ্ঞানের অ বিন্দুর সঙ্গে হ্) লিত থাকে বলে জগদজ্ঞানকে ঋষিরা নাম দিয়েছেন ভ্রান্তজ্ঞান। কাজেই ক্রয়াভেদে জ্ঞানের তিন অবস্থা—জ্ঞান, ভ্রান্তি-জ্ঞান এবং অজ্ঞান।

ক্রিয়া দুটি অতীব সূক্ষ্ম। দেহের আন্দোলন সেই সূক্ষ্ম জীবনক্রিয়ারই লপ্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার ফলে ফুসফুস প্রসারিত হয়, াসারন্ধ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে, আবার বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়ার জন্য ফুসফুস ংকুচিত হয়, প্রবিষ্ট বায়ু আবার বেরিয়ে যায়। এর নাম শ্বাসকার্য। শ্বাসকার্য সই সূক্ষ্ম ক্রিয়া দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আসলে এ শ্বাসকার্য ধ্বনিত প্রণব বং হ্‌কারেই কার্য।

শ্বাসকার্য যে সেই প্রণব এবং হ্‌কারেরই কার্য তা কি করে বুঝব? বংবিধ সংশয় নিরসন করার জন্য সূত্রকার বলেছেন

অ-উ-ম্ আকর্ষণে, হ্ বিকর্ষণে ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ: আকর্ষণ কালে প্রণবধ্বনি এবং বিকর্ষণ কালে হ্ ধ্বনি হয়।

English Translation : Attractive action is accompanied y the Pranab-sound while the repulsive action is accom-anied by the Hah-sound.

ীনিকা: আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া দুটি দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। যখানে ক্রিয়া আছে সেখানে ধ্বনি অবশ্যই আছে। ধ্বনি ব্যতীত কোন ক্রিয়া ম্পন্ন হয় না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূলেও অবশ্যই কোন না কোন ধ্বনি াকবে।

দেখা যায় মুখ বন্ধ করে শ্বাস আকর্ষণ করলে আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ামূলে

নাসামূলে উঁ ধ্বনি হয়, এবং মুখ খুলে শ্বাস আকর্ষণ করলে আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ামূলে কণ্ঠে অ ধ্বনি হয়। আবার মুখ বন্ধ করে শ্বাস নিক্ষেপ করলে বিপেক্ষণাত্মক ক্রিয়ামূলে নাসামূলে হুঁ এবং মুখ খুলে শ্বাস নিক্ষেপ করলে কণ্ঠে হ্ ধ্বনি হয়। অর্থাৎ

আকর্ষণক্রিয়া মূলে ধ্বনি		বিকর্ষণ ক্রিয়া মূলে ধ্বনি
নাসামূলে	উঁ	হুঁ*
কণ্ঠে	অ	হ্

অতএব দেখা যায়, হ্ ধ্বনি ই বিক্ষেপণাত্মক এবং অ এবং উঁ বা অ-উ-ম্ (ঁ= নাদ বিন্দু = ম্) ধ্বনিই আকর্ষণাত্মক।

অতএব বুঝতে হবে হ্ ই জ্ঞানকে নামিয়ে নিয়ে আসে। অতএব যদি হ্ কে পুর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায় তা'হলেই জ্ঞান স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকবে।

পুর্ববর্তী (৭নং) সূত্রে সূত্রকার বলেছেন যে শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে আত্মা প্রত্যক্ষ করতে হবে। শ্বাস ক্রিয়ার দুটি ধারা—একটি আকর্ষণাত্মক, অপরটি বিপেক্ষপণাত্মক। বলা বাহুল্য আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ারই অনুগমন করতে হবে। কিন্তু শুধু আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অনুগমন করলে আত্মদর্শন হয় না বলেই সূত্রকার অ-উ-ম্ (অর্থাৎ প্রণব ধ্বনি) এবং হ্ কার ধ্বনির উল্লেখ করেছেন। শুধু আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ায় হ্ নাই। অর্থাৎ অজ্ঞানতা অজ্ঞানতার স্থানেই থেকে যায়। অজ্ঞানতা থাকলে জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। এজন্য বহু বড় বড় প্রাণায়াম কারীরও আত্মদর্শন কখন কখন হয় না। তারা প্রাণায়াম সাহায্যে বহু অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকেন—কেউ কেউ বহু দিন মাটির নীচে থাকতে পারার ক্ষমতা প্রদর্শন করে লোকদিগকে চমক লাগিয়ে দেন, কিন্তু তাই বলে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন এরূপ নিশ্চয় করে বলা যায় না। যে ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে অজ্ঞানতা না সরালে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। জ্ঞান ত আছেই। জ্ঞান নূতন করে পাবার মত কিছু নয়। শুধু যে অজ্ঞানতা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে দূর করা। হ্ ই ভ্রান্তি। হ্ ই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেখান থেকে হ্ বিস্তার লাভ করছে সেখানেই তাকে ফিরিয়ে নিতে পারলে

* টীকা: হ্ নাসামূলে ম এবং উ দ্বারা প্রভাবিত থাকে বলে ম এবং উ যুক্ত হয়ে ধ্বনিত হয়।

আর সে বিস্তার লাভ করতে পারবে না। হ র প্রাবল্যে জ্ঞান স্পন্দিত হচ্ছে। হ্ কে তার উৎসে ফিরে নিতে পারলে হ্ খর্ব ও লুপ্ত হবে। তখন জ্ঞান আর স্পন্দিত হবে না, তখন জ্ঞান শান্ত স্বরূপ অবস্থা লাভ করবে। এর নাম আত্মদর্শন।

এখন প্রশ্ন হল হ্ কে কি ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

ওঁকারেণ ॥১২॥

সূত্রার্থ: ওঁকার সাহায্যেই হ্ কারকে উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে খর্ব ও লুপ্ত করা যায়।

English Tɪanslation : The Hah can be restored to its posıtion of origin and shortened to naught by means of Pranaba.

লীনিকা: পূর্বেই বলা হয়েছে যে হ্ হল বিক্ষেপণ। বিক্ষেপণকে খর্ব এবং ধীরে ধীরে নির্মূল করতে হলে আকর্ষণ-সাহায্যেই করতে হবে। আকর্ষণ কার? পূর্বেই বলা হয়েছে আকর্ষণ প্রণবেরই। কাজেই হ্ কে তার উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে খর্ব ও নির্মূল করতে হলে ওঁ কারের সাহায্যেই করতে হবে; ওঁকার দিয়েই পতনশীল হ্ কে আকর্ষণ করতে হবে। হ্ কে ওঁকার দিয়ে আকর্ষণ করলে "হং" ধ্বনি হয়। শ্বাসের আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার সময় মনে মনে "হং" ধ্বনি করলে হ্ প্রণবের দিকে ফিরে যায়।

পূর্বে বলা হয়েছিল যে আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা সম্ভব, জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞান লাভ সম্ভব। জ্ঞানই অজ্ঞানতা দূর করতে পারে, আর অজ্ঞানতা দূর হলেই জ্ঞান লাভ হয়। হ্ ই অজ্ঞানতা এবং প্রণবই জ্ঞান। প্রণব দ্বারা হ্ কে খর্ব তথা দূর করলেই জ্ঞান স্বরূপে ফিরে যায়। কাজেই জ্ঞানস্বরূপ প্রণবে ফিরে যাওয়া প্রণব দ্বারাই সম্ভব। আশা করি আত্মা দিয়ে আত্মদর্শনের তাৎপর্য এখন সকলের পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। প্রণব দ্বারা হ্ কে আকর্ষণ করলে হ্ প্রণব অভিমুখে ফিরে যায়। এ অতি সাধারণ কথা।

এখন প্রশ্ন হবে, শ্বাসের আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার সময় মনে মনে "হং" করলেই যদি হ্ খর্ব হয়ে জ্ঞান হয়ে যায় তা'হলে মনে মনে একবার 'হং' করতেই

জ্ঞান হচ্ছে না কেন ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলছেন যে আমাদের অজ্ঞানতার সংস্কার বড়ই প্রবল। হ্ এর প্রভাব এত বেশী যে "হং" ধ্বনিযোগে হ্‌কে প্রণব দ্বারা আকর্ষণ করলেও হ্ প্রণব স্বরূপে উপস্থিত হবার আগেই আবার হ্‌এর বিক্ষেপণ শুরু হয়ে যায়, তখন বিক্ষেপণ ক্রিয়া (নিঃশ্বাসকার্য) র ফলে হ্‌এর পুনরায় পতন ঘটে। হ্ এর পতন ঘটে যায় বলেই "হং" ধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানলাভ হয় না। হ্‌কে পুনরায় মূলাধারে পতন থেকে রক্ষা করতে না পারলে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হবে হ্‌কে পতন থেকে রক্ষা করার উপায় কি ? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

স উপায়ঃ ॥১৩॥

সূত্রার্থ : সঃই হ্ কারকে পতন থেকে রক্ষা করার উপায়।

English Translation: 'Sa' is the Means by which 'Hah' can be held back (from falling down to the Sex-root).

টীকা : আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল উপায় সম্বন্ধে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় কি, এতৎ প্রসঙ্গেই আত্মদর্শন বা সর্বমীমাংসার সূচনা। বহু প্রসঙ্গ আলোচনার পর এতক্ষণে সূত্রকার উপায় কি তা বলছেন—সূত্রকার বলছেন "সঃ" ই উপায়। ঋষিরা সাধনা দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে হ্ ই ভ্রান্তি। হ্‌কে পুনরায় ওঁকারের সাহায্যে প্রণবে ফিরিয়ে নেবার উপায়ও একদিন ঋষিরা আবিষ্কার করলেন। তারা বহু সাধনা দ্বারা হ্‌কে ওঁকার দ্বারা "হং" ধ্বনি যোগে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করার উপায়ও আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ঋষিরা দেখলেন যে ওঁকার সাহায্যে হ্‌কে একবার তুললেও স্ব-গতিবশে হ্ পুনরায় মূলাধারে নেমে পড়ে। ঋষিরা তখন হ্‌কে পতন থেকে রক্ষা করার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন এবং একদিন আবিষ্কার করলেন যে "সঃ" দ্বারাই তা পারা যায়, সঃ ই হ্‌কে পতন থেকে রক্ষা করার উপায়। "সঃ" আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, সঃই সাধনার কৌশল। আকর্ষণাত্মক শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে প্রণবযোগে হ্‌কে আকর্ষণ করার পর পুনরায় যখন বিক্ষেপণ ক্রিয়া সুরু হয় তখন নিঃশ্বাস বায়ুকে নাক দ্বারা ক্ষেপণ না করে, সঃ ধ্বনি যোগে কৌশলক্রমে মুখ দ্বারা নিক্ষেপ করলে হ্ আর

মূলাধারে পতিত হয় না। এরূপে শ্বাসগ্রহণের সময় হং এবং নিক্ষেপের সময় সঃ করার একটা বিশেষ কৌশল আছে। হং এবং সঃ যোগে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত "হংসঃ"* মহামন্ত্র। ইহাকে মূলমন্ত্র বা অজপা ও বলে। হংসঃ আর প্রণব প্রভেদ।

হং যোগে আকর্ষণ এবং সঃ যোগে বিসর্জন প্রক্রিয়া দৃঢ় হলে হ্ এর টান খব হয়ে যায়। ক্রিয়ার গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। হ্ যেখানে উৎপত্তি হয় সেখানে ফিরে গিয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

হংস-মন্ত্র অভ্যাস একটি আধ্যাত্মিক যোগ। যে কোন কিছু অভ্যাস করতে হলে নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হয়, এলোমেলো ভাবে করলে কিছুই হয় না। বস্তু বিজ্ঞানে চুম্বকীকরণের (Magnetisation) একটি নিয়ম আছে। কোন একটি লৌহ খণ্ডকে একটি চুম্বকের যে কোন এক প্রান্ত দ্বারা একই ভাবে ক্রমাগত ঘর্ষণ করতে থাকলে লৌহখণ্ড চুম্বকীত হয়ে চুম্বকই হয়ে যায়। কিন্তু ঘর্ষণকার্যটি অনিয়মে করলে কাজ হবে না। ঘর্ষণকালে যদি চুম্বকের প্রান্তপরিবর্তন করা হয় কিংবা ঘর্ষণের দিকপরিবর্তন করা হয় তা'হলে শত ঘসলেও লৌহ আর চুম্বক হবে না। তেমনি হংস মন্ত্রের অভ্যাস যথানিয়মে করলেই তবে আত্মার প্রত্যক্ষ হবে এলোমেলো ভাবে হাজার করলেও কোন ফল হবে না।

সাধারণত যোগকৌশল গুরুগম্য। শাস্ত্রাদিতে যোগকৌশলেব ইঙ্গিত থাকলেও স্পষ্ট উক্তি নাই। শাস্ত্রাদিতে আছে সদাচার, নৈতিক উপদেশ প্রভৃতি যোগাঙ্গের আলোচনা। যোগাঙ্গ যোগ না হলেও যোগের অঙ্গ। যোগপ্রসঙ্গে যোগাঙ্গের আলোচনা তাই অবশ্য কর্তব্য।

যোগের উদ্দেশ্য হলো মনকে শান্ত করা। মন আত্মারই স্পন্দন (vibration)। স্পন্দন যোগেই যত ভ্রান্তি। ভ্রান্তি নিরসনের জন্য মনকে শান্ত করা চাই। মনের উত্তেজনা যত বেশী হবে মন ততই অশান্ত হবে। কাজেই উত্তেজনা দমনের জন্য চাই—

১। আহার শুদ্ধি: মনকে খাদ্যেরই পরিণাম বলা হয়। খাদ্য যদি উত্তেজক হয় দেহে উত্তেজনা জাগবেই। মদ গাঁজা সেবনে নেশা হয়,বিষ সেবনে মৃত্যু হয়, উত্তেজক খাদ্য গ্রহণে উত্তেজনা জাগবেই। কাজেই আত্মদর্শীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণই কাম্য। আজকাল এই ভেজালের যুগে সাত্ত্বিক

টীকা: হংসঃ মন্ত্রের সঃটি নীলিকায় যদিও ':' দিয়ে লেখা হয়েছে তবু তা উচ্চারণ করার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। সে নিয়ম অভ্যাস করাই সাধনা। সাধনা গুরুগম্য।

আহার সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। ভেজাল দুধ-ঘির চেয়ে ববং মাছ-মাংস ভাল। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নিরামিশ আহাবই শ্রেয়। তবে তাতে শরীরেব পুষ্টি সাধন না হলে অল্পমশলাযুক্ত পেঁয়াজ-রসুন-বর্জিত তাজা মাংস ডিম বা মাছ খাওয়া যেতে পারে। খাদ্যের গুণাগুণ বিচার কবলে দেখা যায় শাকসজী সত্বগুণাত্মক, মাংসডিম রজগুণাত্মক, মাছ তমগুণাত্মক, তবে পেঁয়াজ, রসুন, শুটকী এবং বাসী ও ভেজাল খাদ্য ঘোব তমগুণাত্মক। তা সর্বথা পবিত্যাজ্য।

২। সংযম. সংযম মানেই চিত্তসংযম। চিত্তসংযমেব জন্য ইন্দ্রিয় সংযম অবশ্যই প্রয়োজনীয়। যত ইন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে উপস্থেন্দ্রিয় সবচেয়ে অসংযত। ফ্রয়েড নামক মনস্তাত্বিক ত মনে কবেন যে মানুষেব সবকাজ, সবচিন্তা, সবসম্বন্ধ উপস্থ পবিচালিত (sex-guided)। ফ্রয়েডের মত সর্ববস্থায় গ্রাহ্য না হলেও বহু ব্যাপাবে একথা অতি সত্য। এ পৃথিবীতে যত প্রকাবেব সুখভোগ আছে তন্মধ্যে বতিসুখেব মত সুখকব বোধ হয় আব কিছু নাই। স্ত্রীপুরুষ সকলেই এ সুখেব আকাঙ্ক্ষা করে—পরায়ণদের এ আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী। এজন্যই স্ত্রী পুরুষেব এবং পুরুষ স্ত্রীব সঙ্গ কামনা সব সময় কবে। এব থেকেই ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত কবেছেন যে মানুষের সব ব্যবহাব ও ভাবধারা উপস্থপরিচালিত।

এ সুখ কিসের জন্য হয়। পুরুষ মনে করে নাবী দেহই সুখের আধাব, নারী ভাবে পুরুষ দেহই সুখের আধার। বাস্তবিক পক্ষে নিজ দেহই প্রত্যেকের সুখেব আধাব। পূর্বে দেহে প্রবাহিত যে দুইটি ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তাব আকর্ষণাত্মকটিকে প্রাণও বলে, আবাব বিকর্ষণাত্মকটিকে অপানও বলে। প্রাণ ও অপান যতক্ষণ সমতা বক্ষা কবে প্রবাহিত হয় তখন দেহ ও মনের গতি স্বাভাবিক এবং শান্ত থাকে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, শান্ত অবস্থায় মানুষ শান্তি পায় না, সুখে থাকতে ভূতে কীলোয। তাই কোন রকমে একটা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করেই সে পারে না। পৃথিবীতে বর্তমানে যে অশান্তির উত্তাপ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিতে মানুষ থাকতেই পাবে না। কাবণ হ্‌কাবের বিক্ষেপণগতি সব সময় তাকে অশান্ত করে তুলছে। মানুষ হ্‌কারের বশবর্তী। হ্‌কাবের গতি অর্থাৎ অপানেব গতি বৃদ্ধি পেলে সে এক সুখ পায়। ফুটবল খেলার সময় দেখা যায় খেলোয়াড়বা হাফাচ্ছে। কারণ ছুটাছুটিতে অপানের গতি বর্ধিত হওয়ায় প্রাণ খর্ব হয়ে পড়ে। প্রাণ খর্ব হওয়া দুঃখেব। দুঃখেই

খেলোয়াড় হাফায়। তবু তার এটাই সুখ। অপানবৃদ্ধির জন্য দেহে এক উত্তেজনাময় সুখ অনুভব হয় বলেই খেলার এত আগ্রহ। রতিকালে অপানের গতি খুব বৃদ্ধি পায়। তখন দেহের নিম্নগক্রিয়া স্রোত এত প্রবল হয় যে এর ফলে রেতঃপাত ঘটে। তা সুখের নয়। সুখটা পাওয়া যায় দেহে নিম্নগ স্রোতপ্রবাহের জন্যই। এখন নিম্নস্রোতের অর্থই হল হ্ কারের নিম্নগতি।

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে আত্মদর্শন করতে গেলে হ্ কে খর্ব করে উর্দ্ধে তুলে নিয়ে যেতে হবে—তা করতে গেলে আকর্ষণ বা প্রাণক্রিয়াকে বৃদ্ধি করা চাই। তা না করে অপানকে বর্ধিত করলে ত প্রাণই খর্ব হয়ে পড়বে। আত্মদর্শনের জন্য যা করণীয় তার বিপরীত কাজ করলে বিপরীত ফলই হবে। আত্মদর্শন আর হবে না। কাজেই আত্মদর্শন করতে গেলে ইন্দ্রিয়কে সংযত করতেই হবে। অব্রহ্মচারীর পক্ষে আত্মদর্শন অসম্ভব। যারা বলে ইন্দ্রিয়ের অসংযম এবং আত্মার দর্শন দুটোই সম্ভব তারা অসত্যবাদী। অবশ্য সংযত ব্যবহারে ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না। ঋতুকালে ঋতুরক্ষার জন্য স্ত্রীস্বামীতে সহবাস ব্রহ্মচর্যের অন্তর্গত বলেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা আছে। কিন্তু এখনত আর উপনিষদের কাল নেই। সংযম কথাটাই বর্তমানে নাসিকা কুঞ্চনের বিষয়। কিন্তু হলেও আত্মদর্শনাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে সংযম অপরিহার্য। নারীর পক্ষে পুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে নারীর চিন্তাতেও হ্ কারের টান বর্ধিত হয়। নারীপুরুষ এক সঙ্গে বসে আড্ডা দিলে, গল্প করলে পরস্পরের এক সুখ হয়। হেতু আর কিছু নয়, অপান বৃদ্ধি। কাজেই আত্মদর্শনাভিলাষী পুরুষকে নারীসঙ্গ এবং নারীকে পুরুষসঙ্গ যতদূর সম্ভব ত্যাগ করার কথাই শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে।

অবশ্য শাস্ত্রাদিতে পুরুষকে নারীসঙ্গ ত্যাগের কথা যেভাবে বলা হয়েছে নারীকে পুরুষসঙ্গ ত্যাগের কথা ততটা জোর দিয়ে বলা হয় নি। কারণ নারীদেহটা ত্যাগপথের সহায়ক নহে। নারীদেহে স্বভাবতই ঋতুর উদয় হয়। ঋতুকালে আসঙ্গের ইচ্ছা স্বভাবতই জাগে। ত্যাগ যে বাস্তবিকই কঠিন। নারীর পক্ষে আরও কঠিন। তাই নারীকে ত্যাগের পথে চলার জন্য আহ্বান করা হয়নি। কিন্তু এপথও তাদের জন্য রুদ্ধ নয়। গার্গী মৈত্রীয়র কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। মীরাবাঈ স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিলেন; গৌরীমা সংসারে প্রবেশ করেন নি। আনন্দময়ীমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবন স্বামীস্ত্রীর মত নহে, মাতা পুত্রের মত (বলে আমি যোগানন্দ [পরমহংসের আত্মচরিতে পড়েছি), রামকৃষ্ণ-

সারদামনির যে জীবন ছিল তাও সংযত। মোটকথা সংযম ব্যতীত আত্মদর্শন অসম্ভব।

৩। আসন: আহার ও চিত্তশুদ্ধির মত আসনও যোগাঙ্গ মধ্যে গণ্য। তবে আহার ও সংযম জীবনধারার অন্তর্ভুক্ত, আসন যোগেরই অন্তর্গত। মনকে স্থির করতে গেলে প্রথম দেহস্থৈর্যের প্রয়োজন, তজ্জন্য আসন। আসন বহু প্রকারের আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, অর্ধপদ্মাসন, শঙ্করাসন প্রভৃতিই প্রশস্ত। যে যে আসনে আরামে উপবেশন করতে পারে সে সে আসনেই উপবেশন করবে।

আসন করে দেহটাকে ঋজু করে বসতে হবে। কোমর ও বুক টান হওয়া চাই, মাথা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হেলানো থাকবে, মুখ ঈষৎ ফাঁক থাকবে, যেন দাঁতে দাঁত না লাগে।

দৃষ্টি থাকবে হৃদয়ে। অর্থাৎ দুই ভ্রূর মধ্যে নাসিকামূলে অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টি স্থাপনা করে যতদূর সম্ভব ঊর্ধ্বে (আকাশে) নিক্ষেপ করতে হবে। চোখ প্রায় বোঝা থাকবে, ভ্রূ ঊর্ধ্বদিকে টানা থাকবে। এরূপে আসনে উপবিষ্ট হয়ে যোগাভ্যাস করতে হবে।

যোগ, পূর্বেই বলেছি, গুরুগম্য। শাস্ত্রাদিতে যোগের ইঙ্গিতমাত্র থাকে। যোগাসনে বসে গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে যোগাভ্যাস করতে হয়। অভ্যাসের অবলম্বন ধ্বনি। ধ্বনিযোগে মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্র একাধিক। তন্মধ্যে গুরুমন্ত্র, বীজমন্ত্র এবং মূলমন্ত্র প্রধান। হংসই মূলমন্ত্র বা অজপা। হ্‌কারকে পরিত্যাগ করে ওঁকারে উপস্থিত হওয়াই মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু হ্‌ কে এমনিতে ত্যাগ করা যায় না। তাই প্রণবদিয়ে তাকে তুলে নিয়ে তার উৎপত্তিস্থলে নির্মূল করে দিতে হয়। 'হং' ধ্বনির মননে হ্‌ আকর্ষিত হয়। কিন্তু হ্‌কারের গতি প্রবল বলে আবার মূলাধারে তার পতন ঘটে। মূলাধারে পতন রোধ করার জন্য "সঃ" ধ্বনিযোগে তাকে বাইরে নিক্ষেপ করতে হয়। এরূপে হংসঃ মন্ত্রের অভ্যাস করতে হয়।

হংসমন্ত্রের অভ্যাস করলে কি হবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

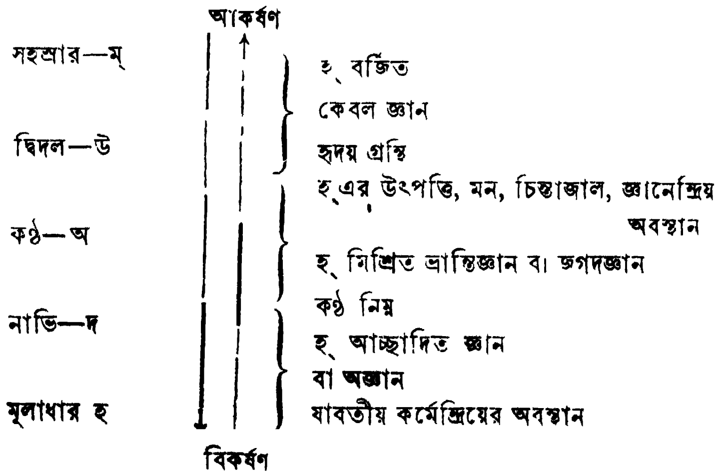
প্রত্যক্ষে সন্দেহাত্যয় ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ: হংসযোগ অভ্যাসে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না।

English Translation: Regular practice of Hamsayoga

helps attaining the soul. As soon as the self is attained all doubts remove.

লীনিকা : মূলমন্ত্রের দৃঢ় অভ্যাস হলে হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায়। হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায় কথাটাকে একটু খুলে বলা উচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ক্রিয়াসন্ধিকে কণ্ঠের উর্দ্ধে তুলে নিলে জগদ্‌জ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান লোপ পায়, তখন জ্ঞানই থাকে। কণ্ঠের উর্দ্ধে তুলতে গেলে তার আর একটি জায়গা থাকা চাই। সে জায়গা হল আজ্ঞাচক্র, বা দ্বিদল বা ভ্রূমধ্য বা নাসামূল, বা হৃদয়। কিন্তু ওখানে ক্রিয়াসন্ধিকে কিছুতেই সহজে তোলা যায় না, কিসে যেন আটকায়। কিসে আটকায়? চিন্তা। বস্তুত ঐখানেই সব কিছুর উৎপত্তি। ঐখানের নিম্নআবর্তের নাম মন। ঐখান থেকেই হ্‌ এর সুরু। অভ্যাসে বসলেই দেখা যায় ঐখান থেকেই হাবিজাবি চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এ চিন্তার বিরাম নাই। ইচ্ছা করেও এ চিন্তার স্রোত বন্ধ করা যায় না। আর কত রকমের চিন্তাই না আছে। ভালমন্দ কোন কিছু বাদ নেই। যে বিন্দু থেকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সে বিন্দুর নাম হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয় একটা বশি নয় এবং তাতে একটা গেরো দেওয়াও থাকে না। যে বিন্দুর অধঃভাগ থেকে ভ্রান্তির আরম্ভ সে বিন্দুর নামই হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়ে উপস্থিত হবার পূর্বভাগ। যে বিন্দুর অধঃভাগ থেকে ভ্রান্তিজাল সুরু হয়েছে তার নাম উ। প্রণবে স্পন্দন জাগার পর প্রণব যখন ত্রিধা হতে আরম্ভ করে তখন ওঁকার ম-উ-অ হয়ে যায় এবং হ ম্‌ থেকে প্রথম উ, তারপর অ হয়ে হ্‌তে নামে। জিনিষটা এরূপ—



অথবা

[ম্ উ] কেবল জ্ঞান জ্ঞান
হৃদয় গ্রন্থি
[অ] ভ্রান্তি মিশ্রিত জ্ঞান
[হ] অজ্ঞানাচ্ছন্ন জ্ঞান

এখন ক্রিয়াসন্ধিকে কণ্ঠ থেকে আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদলে তুলতে গেলেই এক চিন্তাস্রোত এসে বাধা প্রদান করে। যে স্থানথেকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় সে স্থানের নাম হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়ে উপস্থিত হবার দ্বার। শাস্ত্রাদিতে এ চিন্তাস্রোতকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এ চিন্তার মেঘরাশি হৃদাকাশে অবস্থিত জ্ঞানসূর্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে বলে জ্ঞান সদা অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। এ চিন্তারাশি আর কিছুই নয়, কতকগুলি শব্দের তরঙ্গ। শব্দগুলি অনুচ্চারিত ধ্বনি বই আর কিছুই নয়। এই শব্দপ্রবাহের তাড়নায় মন আলোড়িত হয়। শব্দের পর শব্দপ্রবাহ আসছে মনও বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

মন হল একটি বিন্দু। মন একসঙ্গে একাধিক শব্দ বা ধ্বনির সহিত যুক্ত থাকতে পারে না। প্রত্যেক ধ্বনির সঙ্গে মন একবার করে যুক্ত হচ্ছে, এরূপ ধ্বনি থেকে আর এক ধ্বনিতে যুক্ত হতে গিয়েই আলোড়িত হচ্ছে। কাজেই মনকে শান্ত করতে গেলে মনকে কোন এক ধ্বনিতে যুক্ত রাখতে হয়। এ উদ্দেশ্যেই মন্ত্রজপের ব্যবস্থা। যতগুলি বীজমন্ত্র আছে প্রত্যেকটিই প্রণবযুক্ত। হ্রীঁ, ক্রীঁ, ঐঁ বা প্রভৃতি প্রণবযুক্ত। উদ্দেশ্য যেন মন প্রণবের নাদ বিন্দুতে যুক্ত হয়।

হংসঃ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। হ্‌কে খর্ব করে তার উৎপত্তি স্থলে নিয়ে লয় করে দেওয়ার জন্যই হংসমন্ত্র। হ্‌ লুপ্ত হলেই অজ্ঞানও লুপ্ত হয়, জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু হৃদয়গ্রন্থি তাকে হৃদয়ে (উকারে) যেতে দেয় না। চিন্তাস্রোত তাকে বাধা প্রদান করে। এক্ষণে, হংসঃ মন্ত্র জপ করতে করতে মন যদি প্রণবসংযুক্ত হয়ে যায় তা'হলে অন্য ধ্বনি বা শব্দ বা চিন্তা আর মনে স্থান পেতে পারে না চিন্তাপরিশূন্য হলেই মন শান্ত হয়। মনের এ চিন্তা পরিশূন্য হওয়ার নাম হৃদয়গ্রন্থি মুক্তহওয়া। হৃদয়গ্রন্থিমুক্ত জ্ঞান উকারে উঠে যায়। উকারে জ্ঞান হ্‌এর সঙ্গে অনুভবযুক্ত থাকে না। তখন

জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হয়, আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। তখন বুঝা যায় যে জ্ঞানে একমাত্র জ্ঞানই অবস্থিত। এরই নাম আত্মদর্শন।

টীকা: হৃদয়গ্রন্থি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মার মুক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম অনিবার্য। যে চিন্তাজাল হৃদয়ে ছড়িয়ে আছে তার রূপ ফোটভাষা। হৃদয়গ্রন্থির অভিমুখে যতই যাওয়া যায় এ ভাষা ততই ক্ষীণ হতে হতে ভাবনায় রূপান্তরিত হয়। এ ভাষাহীন ভাবনাই জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ। স্থূল দেহের পতনের পরও সূক্ষ্মদেহ থাকে। এ সূক্ষ্মদেহী ইন্দ্রিয়বিহীন হয়েও ইন্দ্রিয় গুণযুক্ত। ভাবনা কর্মের অনুরূপ হয়। ভাবনানুযায়ী জীবাত্মা, পুনজন্মের আবর্ত চক্রে পতিত হয় এবং কর্মানুযায়ী দেহ লাভ করে। কর্মের সংস্কার নিয়ে আমরা জন্মাই। আমাদের বর্তমান জীবনের unconcious mind পূর্বজীবনের সংস্কার মাত্র। এরূপে জীবাত্মা জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম লাভ করে। হৃদয়গ্রন্থি মুক্ত হলে জ্ঞানের স্বরূপে উপনীত হলে ভাবনা থাকে না। তখন জীবাত্মাই পরমাত্মা হয়। জলের ঢেউ যেমন জলই, আত্মাও তেমনি পরমাত্মাই। আন্দোলন বন্ধ হলে যেমন ঢেউই জল হয়, ভাবনা বন্ধ হলে জীবাত্মাই পরমাত্মা হয়। ঢেউ জল হয়ে গেলেও যেমন কিছুই ধ্বংস হয় না, জীবত্মা পরমাত্মা হয়ে গেলেও কিছু ধ্বংস হয় না। কোন কিছুই ধ্বংস হয় না কেবল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মাত্র। ভ্রান্ত অবস্থা থেকে জ্ঞানাবস্থায় উপস্থিত হওয়াই আত্মদর্শন।

আত্মদর্শন হলে কি হয়? তদুত্তরে সূত্রকার বলছেন

সর্বমীমাংসা ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ: আত্মদর্শন হলেই সব মীমাংসা হয়ে যায়।

English Translation: Every thing stands finally decided as soon as the self is realised.

লীনিকা: আত্মদর্শন হলে সব মীমাংসা হয়ে যায়, তখন আর কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে না। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে ততক্ষণ আত্মদর্শন হয়নি বুঝতে হবে।

ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠচ্যুত হয়ে 'উ'তে যায় তখন 'উ'তে জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান (হ্) অনুভবযুক্ত থাকে না বলে জ্ঞানে কোন ভ্রান্তি থাকে না। ভ্রান্তিহীন জ্ঞানই জ্ঞানের স্বরূপ বা আত্মা। স্বরূপজ্ঞানকে নির্ধূম পাবকের সঙ্গে শাস্ত্রাদিতে তুলনা করা হয়েছে—পাবক নির্ধূম হলে যেরূপ হবে জ্ঞানের স্বরূপ তেমনি। জ্ঞান যখন 'উ'কারে অবস্থান করে তখন জ্ঞানে জগৎ থাকে না, লোপ পায়। কিন্তু জগতের স্মৃতি তবু থাকে। এ অবস্থায়ই বুঝতে পারা

যায় যে জগৎ ভ্রান্তি। স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রত হলে যেমন বুঝা যায় স্বপ্ন ভ্রান্তি জাগ্রত অবস্থাই সত্য তেমনি জ্ঞান হলেই বুঝা যায় যে জগৎই ভ্রান্ত জ্ঞানই সত্য।

উ অতিক্রম করে মৃতে যখন জ্ঞান পুনরায় ফিরে যায় তখন আর জগতের স্মৃতিও থাকে না। কিছুই থাকে না। মৃতে কোন ক্রিয়া নাই, ক্রিয়াসন্ধিও নাই, কল্পনা নাই, কিছু নাই। ইহাই জ্ঞানের শান্ত স্বরূপঅবস্থা। এ অবস্থার নামই পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম অবস্থা। এ অবস্থার কোন বর্ণনা নাই। শাস্ত্র সে অবস্থার এক নেতিবোধক বর্ণনা করেছেন—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্যঃ, ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ" বলে। এতাধিক বলার কারো সাধ্য নাই। ঐ অবস্থা লাভ হলে প্রাপ্তির আর কিছু বাকী থাকে না। অতএব মীমাংসা করা গেল যে—

১। জীব নিজের মধ্যে যে এক অপরিপূরণীয় অভাব অনুভব করে তাই তার দুঃখ।

২। বস্তু বা বিষয় দ্বারা জীবের অভাব দূর হয় না, ফলে দুঃখও যায় না।

৩। কিংবা বিষয়ের খবরের দ্বারাও তার জানার তৃষার নিবৃত্তি হয় না, জ্ঞান পূর্ণ হয় না, জিজ্ঞাসার শেষ হয় না।

৪। আসলে মানুষের অভাব হল স্বভাবের, জানার তৃষ্ণা জ্ঞানেরই।

৫। জীব ও জগৎ ভ্রান্তির সৃষ্টি। ভ্রান্তি যা তা আছে মনে হলেও অন্তর্হিত হয়ে যায় বলে স্বরূপত তার কোন অস্তিত্ব নাই। জগতেরও স্বরূপত কোন অস্তিত্ব নাই। জগতের অস্তিত্ব কেবল রূপে।

তর্ক: আত্মদর্শনে বার বার জগৎকে ভ্রান্তি বলা হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন মায়া। ভ্রান্তিবাদে কি মায়াবাদেরই পুনপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হয়েছে?

সিদ্ধান্ত: ভ্রান্তি বা মায়া 'বাদ' হয় না। আত্মদর্শনে কোন বাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়নি। আত্মদর্শনে কোন বাদ থাকলে তা জ্ঞানবাদ।

তর্ক: জগৎ যদি স্বরূপত না থাকে তাহলে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে আত্মদর্শন নামক দর্শনে যা বলা হয়েছে তা মিথ্যা?

উত্তর: তা মিথ্যা নয়। স্বরূপ জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত তাই সত্য আর স্বরূপ জ্ঞান একবার হলে সত্যমিথ্যার প্রশ্নও থাকে না।

৬। মানুষের ক্রিয়াসন্ধি যখন কণ্ঠে অবস্থান করে তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান মিশ্রিত থাকে বলে জীবের আমিত্বজ্ঞান ও জগৎ জ্ঞান থাকে। যখন ক্রিয়া

সন্ধি কণ্ঠের নিম্নে আসে (নিদ্রিত বা মূর্ছিত অবস্থায়) তখন আমিত্বজ্ঞানও থাকে না জগদ্‌জ্ঞানও থাকে না।

৭। ঠিক তেমনি যদি ক্রিয়াসন্ধিকে কোন উপায়ে (অভ্যাস দ্বারা) কণ্ঠের উর্ধ্বে তুলে নেওয়া যায় তখনও আমিত্ব বা জগৎ বলে পৃথক কিছুই থাকে না। তখন কেবল আত্মাই বর্তমান থাকে। আত্মাও জ্ঞানই।

৮। রূপতঃ জগৎ ও আমিই সত্য হলেও স্বরূপতঃ জ্ঞানই সত্য। জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য কিছু নাই। জ্ঞান হলেই সকল কিছুর মীমাংসা হয়। মানুষের সকল ভ্রান্তি, সকল জিজ্ঞাসা জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়।

সমাপ্তোঽয়মধ্যায় পঞ্চমঃ ॥

ইতি আত্মদর্শনে শ্রীনলিনীকান্তচক্রবর্তীবিরচিত-লীনিকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি—আত্মদর্শনসমাপ্তম্ ॥